ফেলস্টাইনী বিপ্লব

কাফি খাঁ

প্রকাশকের কথা

চার দশক আগে অন্ধ্রের নিজামশাহীর বিরুদ্ধে, তেলেঙ্গানার কৃষক-বিপ্লব সামন্তবাদের যাঁতাকলে পিষ্ট ভারতবাসীর কাছে যে প্রশ্ন তুলে ধরেছিল, তার তাৎপর্য আজও অম্লান। মাও সে তুঙের জনযুদ্ধের পথ না নির্বাচনসর্বস্ব সংসদীয় শুয়োরের খোঁয়াড়ে যাত্রা—কোন পথে এগোতে হবে এই প্রশ্ন থেকে দীর্ঘদিন পরে পুনঃপ্রকাশ 'তেলেঙ্গানা বিপ্লব' গ্রন্থের। তেলেঙ্গানায় যে দলগুলি সেদিন কৃষকদের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে গ্রামকে গ্রাম মুক্ত এলাকা গড়ে তুলেছিল, জমিদারদের জমি কেড়ে নিয়ে কৃষকদের হাতে তুলে দিয়েছিল, পুরোন ঋণের দলিল-দস্তাবেজ পুড়িয়ে ফেলেছিল, নিজেদের লাল ফৌজ গড়ে তুলেছিল, নিজামের রেলপথ উড়িয়ে দিয়েছিল—তাঁরা আজও আছেন গোদাবরীর তীরে, শ্রীকাকুলামের পাহাড়ে-জঙ্গলে, আদিলাবাদ ওয়ারাংগলের জনারণ্যে, পালামৌ-জাহানাবাদের গভীর ভূমিতে। তাই তেলেঙ্গানার মৃত্যু নেই—সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম আজও অব্যাহত তেলেঙ্গানার দীপ্তিতে।

তেলেঙ্গানার লড়াই শুরু হয়েছিল হায়দরাবাদের নিজামশাহীর সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে। এই সশস্ত্র সংগ্রাম ছিল কৃষি-বিপ্লবের সংগ্রাম—যার উদ্দেশ্য ছিল সামন্ত-শোষকদের হাত থেকে জমি কেড়ে নিয়ে ভূমিহীন কৃষকের হাতে হস্তান্তর এবং দাস ও অর্ধ-দাস প্রথার বিলোপ ও ধ্বংস-সাধন। এইভাবে তেলেঙ্গানায় তথা সমগ্র ভারতবর্ষে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। তাই তেলেঙ্গানার স্বপ্ন মানুষ আজও বুকে বহন করে চলেছে।

তেলেঙ্গানার সংগ্রাম সংগঠিত ও পরিচালনা করেছিল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। ২০টি জেলার আড়াই হাজার গ্রামের ৫০ লক্ষ মানুষ নিয়ে গড়ে ওঠে 'মুক্তাঞ্চল'—'তেলেঙ্গানার জনগণতন্ত্র'। এই সরকারের নিয়মিত গেরিলা বাহিনী ছিল ৩ হাজার এবং ১০ হাজার কৃষক নিয়ে ছিল গ্রামরক্ষী বাহিনী। কমিউনিস্ট পার্টির সকল সদস্য ও কয়েক লক্ষ নর-নারী যোগদান করেন এই লড়াইয়ে এবং

৪ হাজার কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও সমর্থক প্রাণ দিয়ে এ লড়াইকে বৈপ্লবিক স্তরে উন্নীত করেন, যা নেহেরু-নিজামের পুলিশ ও সেনাবাহিনীর রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির বিশ্বাসঘাতক নেতৃত্ব নেহেরুর সঙ্গে গোপনে আঁতাত ক'রে (যা এখন সেই নেহেরুরই নাতির সঙ্গে টিকে আছে) স্বাধীনতার (!) টোপ দেখিয়ে এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নেতা স্তালিনের নাম করে ও মহান বিপ্লবী মাওকে বিকৃত করে অস্ত্র-সমর্পণ করতে বলে।

লড়াইয়ের ময়দানে থেকে কমরেডরা বুঝতে পারেন নি নেতৃত্বের এহেন বিশ্বাসঘাতকতা। তাঁরা অস্ত্র-সমর্পণ করলেন—মনে করলেন এটাই কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতার উপর বিশ্বস্ততা। যদিও তাঁদের বিশ্লেষণ করা উচিত ছিল যে কমরেড স্তালিন অস্ত্র সমর্পণ করতে বলতে পারেন না।

তবুও তেলেঙ্গানার কমরেডদের—শ্রমিক-কৃষক-ছাত্রদের বৈপ্লবিক সংগ্রামই প্রথম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে বিপ্লবী পার্টিরূপে প্রতিষ্ঠা করল এবং পার্টির মধ্যে বৈপ্লবিক ঐতিহ্যের ভিত্তি রচনা করল। যে ঐতিহ্য তেভাগা-নকশালবাড়ি-শ্রীকাকুলামের সশস্ত্র লড়াইয়ের পথ ধরে ভারতের প্রান্তে-প্রান্তে গ্রামে-গ্রামে কৃষকদের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে লাল-আগুনের মশালের আলোর দীপ্তিতে আজও প্রোজ্জ্বল।

তাই তেলেঙ্গানার ঐতিহাসিক সংগ্রামের বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা এখনও প্রাসঙ্গিক—আশা করি এ প্রকাশের যথার্থতা এখানেই। এই গ্রন্থ যদি ভবিষ্যতের প্রয়োজন কিছুমাত্র মেটায় তাহলেই এ প্রকাশ হবে সার্থক।

২৫শে জুন, ১৯৮৬

যাঁরা আজও

লড়াইয়ের মাটি কামড়ে.....

সূচী

তেলেঙ্গানা বিপ্লবের তাৎপর্য ৯
তেলেঙ্গানার পরিচয় ১৮
তেলেঙ্গানার শোষকগোষ্ঠী ১৯
কৃষক শোষণের রূপ ২০
স্টেট্ কংগ্রেসের আন্দোলন ২১
অন্ধ্র মহাসভার (সঙ্ঘম) জন্ম ও রূপান্তর ২২
১৯৪৪-৪৬ সালের সংগ্রাম ২৩
পি. সি. যোশীর চক্রান্ত ২৭
সংগ্রামের বৈপ্লবিক রূপান্তর ২৯
নিজামশাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ২৯
গেরিলা-যুদ্ধের কাহিনী ৩৭-৪৬
আড়াই হাজার গ্রামে নিজামশাহীর অবসান ৩৭
জনযুদ্ধের কায়দা ৩৮
দলম-সঙ্ঘম ও গণ-শাসন ব্যবস্থা ৪১
দলমের জয়গান ৪৪
কৃষকদের প্রতিশোধ ৪৫
মারাথওয়াড়ার কৃষক-সংগ্রাম ৪৬
কৃষক-সংগ্রামের পাশে শ্রমিকশ্রেণী ৪৮
তেলেঙ্গানা বিপ্লবে শক্তি-সমাবেশ ৫০-৫৩
ক্ষেত মজুর ও দরিদ্র কৃষক ৫০
মাঝারি কৃষক ৫০
ধনী-কৃষক ৫১
ছাত্র-সম্প্রদায় ৫১
তেলেঙ্গানা বিপ্লবে নারীদের অবদান ৫৩-৫৬
নারী শ্রমিকদের মজুরী-বৃদ্ধির সংগ্রাম ৫৪
পুলিশ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে নারীদের সংগ্রাম ৫৪
নারীদের গেরিলাদল ৫৫
তেলেঙ্গানার জনগণতন্ত্র ৫৭
নেহেরু সরকারের আক্রমণ ৬০
অন্ধ্র পার্টির চিঠি ৬২
কমিউনিস্ট নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা ৬৪

তেলেঙ্গানা বিপ্লব

তেলেঙ্গানা বিপ্লবের তাৎপর্য

তেলেঙ্গানা—আজ পর্যন্ত ভারতের সমগ্র ইতিহাসে, বিশেষত বৈপ্লবিক গণ-সংগ্রামের ইতিহাসে, সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা, চিরস্মরণীয়, অমর নাম। ১৯৪৭ সালে ভারতের বড় মিল-মালিক আর সামন্ত জমিদারগোষ্ঠী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে সবেমাত্র শাসন-ভার হাতে পেয়ে দিল্লীর গদিতে জেঁকে বসেছিল। ঠিক তখনই হায়দরাবাদের তেলেঙ্গানার কৃষকগণ বিপ্লবী কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে ভারতের সামন্ততন্ত্রের প্রধান স্তম্ভ নিজামশাহীকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছিল, আরম্ভ করেছিল ভারতের কৃষি-বিপ্লবের প্রথম সশস্ত্র সংগ্রাম। সেদিন এই তেলেঙ্গানাই ভারতের নতুন শাসকগোষ্ঠীর চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল, তেলেঙ্গানার মাটিতে তাদের আসন্ন ধ্বংসের পরোয়ানা দেখে তারা আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। তাই তেলেঙ্গানাকে পিশে মারবার জন্য জওহরলাল নেহেরু আর বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে বড় মালিক আর রাজা-মহারাজ-জমিদারগোষ্ঠীর নতুন গড়া সরকার তাদের অস্ত্র-ভাণ্ডার হায়দরাবাদের নিজামের হাতে তুলে দিয়েছিল, আর শেষ পর্যন্ত নেহেরু-প্যাটেলের বিপুল বাহিনী ছুটে এসেছিল হায়দরাবাদে—তেলেঙ্গানার বিপ্লবী কৃষককে পিশে মারতে।

তাতেও মরেনি তেলেঙ্গানা, অবসান হয়নি তার সংগ্রামের। নিজাম আর নেহেরু-প্যাটেলের সমগ্র সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে তেলেঙ্গানা তার সংগ্রাম চালিয়েছিল হিমালয়ের মত অটল দৃঢ়তা নিয়ে। কৃষকের—শ্রমজীবী জনসাধারণের জাগ্রত সংগ্রাম-শক্তি যে অদম্য, অনিবার্য তা সেদিন প্রমাণ করেছিল তেলেঙ্গানা। নিজাম-নেহেরু-প্যাটেল-জমিদারগোষ্ঠীর সামরিক শক্তির কাছে তেলেঙ্গানা মাথা নত করেনি। সেদিন তার সংগ্রামের সাময়িক

বিরতি ঘটেছিল পঞ্চম বাহিনীর ষড়যন্ত্রে—তখনকার কেন্দ্রীয় কমিউনিস্ট নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতায়। কিন্তু, তাতেও মরেনি, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি তেলেঙ্গানা, সেদিন তার সংগ্রামের সাময়িক বিরতি ঘটেছিল মাত্র।

দীর্ঘ বছর পূর্বের তেলেঙ্গানার সেই সংগ্রামের যুগান্তকারী ইতিহাস আজ অনেকেই ভুলে গেছে, তরুণের দল জানেও না তার কথা। কিন্তু মরেনি তেলেঙ্গানা, মরেনি তার সংগ্রামের বৈপ্লবিক আদর্শ। তেলেঙ্গানার সেই সংগ্রাম আর তার আদর্শ এতকাল সাম্রাজ্যবাদ, একচেটিয়া মালিক আর জমিদারগোষ্ঠীর শোষণ-শাসনে জর্জরিত ভারতের শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে বেঁচে রয়েছে, নিঃশব্দে তার প্রভাব বিস্তার করছে, কৃষকের—শ্রমজীবী জনসাধারণের সংগ্রাম-শক্তিকে ধীরে ধীরে গড়ে তুলছে। আজ দিকে দিকে যে সংগ্রাম গড়ে উঠছে তারই মধ্য দিয়ে আবার আত্মপ্রকাশ করছে তেলেঙ্গানা।

১৯৪৬-৪৭ সালে দেশীয় রাজ্যগুলিতে গণ-আন্দোলন নতুন রূপে দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে দেশীয় রাজ্যগুলির আন্দোলন ছিল কেবল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন। সে সময় ঐ আন্দোলনের দাবি ছিল—(১) দেশীয় রাজাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করা; (২) বেগার প্রথার অবসান; (৩) বিভিন্ন প্রকারের সামন্ততান্ত্রিক ট্যাক্স আদায়ের অবসান। প্রায় সব রাজ্যে তখন কংগ্রেসের নামে বুর্জোয়ারাই তাদের স্বার্থে এই আন্দোলন চালিয়েছিল। ১৯৪৬ সালের শেষভাগ থেকে ১৯৪৭ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের সংগ্রাম সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছিল। তখনও এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল কৃষকদের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রাম। এর মধ্যেও আবার হায়দরাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ আর মহারাষ্ট্রের কৃষক-সংগ্রাম সবচেয়ে ব্যাপক, সবচেয়ে গভীর, আর সবচেয়ে জঙ্গী রূপ ধারণ করেছিল।

ভারতবর্ষের সকল অঞ্চলে এই কৃষক-সংগ্রাম সমানভাবে বিকাশ লাভ করেনি। কেবল হায়দরাবাদের তেলেঙ্গানাতেই এই কৃষক-সংগ্রাম সশস্ত্র বিপ্লবের আকারে দেখা দিয়েছিল। তেলেঙ্গানার এই কৃষক-বিপ্লবের ধ্বনি ছিল—(১) হায়দরাবাদের রাজা নিজামের শাসনের অবসান; (২) সামন্ততান্ত্রিক শোষণের অবসান; (৩) কৃষকের হাতে জমি; (৪) মাদ্রাজের তেলেগু বা অন্ধ্র ভাষা-ভাষী অঞ্চল আর তেলেঙ্গানাকে নিয়ে একটি পৃথক রাজ্যগঠন—বিশাল অন্ধ্রের সৃষ্টি।

তেলেঙ্গানার কৃষকদের এই সশস্ত্র বিপ্লবকে দমন করবার জন্য নিজাম তার বিরাট সৈন্যবাহিনী (প্রায় ২০ হাজার সৈন্য) আর 'রাজাকার' নামে সশস্ত্র গুণ্ডাবাহিনীকে নিযুক্ত করেছিল। বিদ্রোহী কৃষকেরাও আত্মরক্ষার জন্য 'আত্মরক্ষাবাহিনী' আর গেরিলাযুদ্ধের জন্য গেরিলা-বাহিনী গঠন করল। তারা প্রতি গ্রামে বানাল গ্রাম-কমিটি। এই গ্রাম-কমিটির নাম হল 'পঞ্চায়েত'। যে সব গ্রাম নিজামের শাসন থেকে মুক্ত করা হল, সেই সব গ্রামের শাসন-ভার দেওয়া হল এই সব গ্রাম-কমিটির হাতে। মুক্ত অঞ্চলের জমিদারদের সমস্ত জমিজমা বাজেয়াপ্ত করে গরীব কৃষক আর ক্ষেত-মজুরদের মধ্যে বিলি করা হল। এইভাবে তেলেঙ্গানার সংগ্রাম সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিপ্লবের রূপ গ্রহণ করল এবং ভারত-বর্ষের সামন্ততন্ত্রের প্রধান স্তম্ভ হায়দরাবাদের নিজামশাহীর অবসান করবার সংগ্রামে পরিণত হল।

এই সংগ্রামের একটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এই সংগ্রামের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সকল স্তরের কৃষকের ঐক্য। প্রথমে ধনী-কৃষক থেকে ক্ষেত-মজুর পর্যন্ত সমস্ত কৃষকই সংগ্রামে যোগদান করেছিল। কিন্তু সংগ্রাম যতই সশস্ত্র সংগ্রামে পরিণত হতে থাকে ততই ধনী-কৃষকেরা দূরে সরে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সংগ্রামের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে। তারা এমন কি ক্ষেত-মজুরদের দাবি মেনে নিতেও অস্বীকার করে।

তার ফলে ক্রমশ গরীব কৃষক, ক্ষেত-মজুর আর জমিহারা কৃষকরাই এই সশস্ত্র সংগ্রামের প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

এই বিদ্রোহের ফলে ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত ৩০০ গ্রাম 'মুক্ত অঞ্চলে' পরিণত হয়। এই সময় পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত 'অন্ধ্র-মহাসভা'ই এই সশস্ত্র সংগ্রাম পরিচালনা করেছিল। এই সময় 'অন্ধ্র-মহাসভা'র সভ্য-সংখ্যা ছিল দুই লক্ষ। নিজাম সরকারের সৈন্যবাহিনী আর রাজাকার গুণ্ডাদলের মিলিত বাহিনী বিদ্রোহী কৃষকদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাতে লাগল। তারা চাষীদের অন্তত এককোটি টাকার সম্পত্তি লুণ্ঠন করেছিল, ২৫ খানি গ্রাম আগুন দিয়ে সম্পূর্ণ-রূপে ভস্মীভূত করেছিল, আর প্রায় ১০ হাজার ঘর ভেঙ্গে ধূলিসাৎ করেছিল। কেবল ১৯৪৭ সালের মধ্যেই তারা হত্যা করেছিল মোট ৫০০০ কৃষককে। তাদের আক্রমণে প্রায় ১৫ হাজার কৃষক আহত হয়েছিল, আর নিজামের জেলখানায় বন্দী হয়েছিল প্রায় ১০ হাজার। কিন্তু এসব সত্ত্বেও সংগ্রাম চলেছিল পূর্ণোদ্যমে।

১৯৪৮ সালের মধ্যে গোটা হায়দরাবাদ রাজ্যের ৬ ভাগের এক ভাগে, অর্থাৎ তেলেঙ্গানার ৪ ভাগের ৩ ভাগ স্থানের আড়াই হাজার গ্রামে নিজামের শাসন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। নিজামের শাসন-মুক্ত এই বিশাল অঞ্চল পরিণত হয়েছিল ক্ষেতমজুর আর কৃষকের শাসনাধীন বিশাল এক জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। এই বিশাল মুক্ত-অঞ্চলে জমিদারদের সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। এই বাজেয়াপ্ত করা জমির মোট পরিমাণ ছিল ৩৬ লক্ষ বিঘা। এই বিপুল পরিমাণ জমি তেলেঙ্গানার 'মুক্ত অঞ্চলে'র ক্ষেত মজুর, গরীব আর মধ্যস্তরের কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল। 'মুক্ত-অঞ্চলে'র আড়াই হাজার গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'পঞ্চায়েত' নামে জনসাধারণের সরকার আর গণ-আদালত। এই 'মুক্ত-অঞ্চলে'র অধিবাসীদের সংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষেরও কিছু বেশী। 'মুক্ত-অঞ্চলে'র গণসরকার কৃষকদের সমস্ত ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছিল। কৃষক জনসাধারণকে বিপ্লবী রাজনীতি

শেখাবার জন্য বহু স্কুল আর 'স্কোয়াড' (দল) গঠন করা হয়েছিল, আর কৃষক যুবকদের নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছিল একটি বিরাট সৈন্যবাহিনী। এই সৈন্যবাহিনীর সৈন্যরা শান্তির সময় জমিতে কৃষির কাজ করত আর নিজামের সৈন্যরা আক্রমণ করলে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করত।

তেলেঙ্গানার সংগ্রাম কেবল সামন্ততান্ত্রিক জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের জন্যই চালিত হয়নি, সে সংগ্রাম কেবল কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে জমি বিলি করেই ক্ষান্ত হয়নি। তেলেঙ্গানার কৃষক সংগ্রাম করেছিল হায়দরাবাদের বুক থেকে নিজামের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ ও শাসন-ব্যবস্থা নিশ্চিহ্ন করতে, আর হায়দরাবাদের তেলেগু, মারাঠী ও কানাড়ী জাতীয় কৃষকদের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে মুক্ত করে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী স্বজাতির সঙ্গে মিলিত করতে। তেলেগু, মারাঠী আর কানাড়ী জাতীয় কৃষকদের নিজামী শোষণ থেকে মুক্ত করে তাদের নিয়ে বিশাল অন্ধ্র, বিশাল মহারাষ্ট্র আর বিশাল কানাড়া রাজ্য গঠনের পথ প্রস্তুত করাও ছিল তেলেঙ্গানা-বিপ্লবের আর একটি উদ্দেশ্য।

তেলেঙ্গানার কৃষক-সংগ্রাম কেবল ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের প্রধান ঘাঁটি হায়দরাবাদের নিজামশাহী আর তার পৃষ্ঠপোষক নেহেরু-প্যাটেলের ভারত সরকারের উপরেই আঘাত করেনি, তেলেঙ্গানার এই সংগ্রামকে বৃটিশ আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদেরও মুখোমুখী দাঁড়াতে হয়েছিল। সেদিন তেলেঙ্গানার সংগ্রামী কৃষক ভারতবর্ষকে এক নতুন শিকলে বাঁধবার জন্য বৃটিশ আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ষড়যন্ত্র বানচাল করে দিয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর তেলেঙ্গানা-বিপ্লবকে রক্তবন্যায় ডুবিয়ে দেবার জন্য আর ভারতবর্ষকে নতুন দাসত্বের শিকলে বাঁধবার জন্য বৃটিশ আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা নিজামের মুরুব্বি সেজেছিল। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা নিজামকে ঋণ দিয়েছিল ৭৮ কোটি টাকা (৬ কোটি পাউণ্ড) আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা নিজামের জন্য তৈরী করে দিয়েছিল তিনটি অস্ত্র-কারখানা। বহু মার্কিন পরামর্শদাতাও এসে

জুটেছিল হায়দরাবাদে। এই অর্থ আর অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে একলক্ষ সৈন্যের একটি বাহিনী গড়ে তুলতে চেয়েছিল নিজাম। এই সৈন্যবাহিনী দিয়ে তেলেঙ্গানার সংগ্রাম ধ্বংস করা আর হায়দরাবাদে বৃটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক ঘাঁটি গড়ে তোলাই ছিল নিজামের উদ্দেশ্য। তাই সেদিন বৃটিশ আর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা হায়দরাবাদের স্বাধীন থাকার দাবি সমর্থন করেছিল। তেলেঙ্গানার কৃষক-সংগ্রামের আঘাতে এই শয়তানী পরিকল্পনা সেদিন বানচাল হয়ে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে ভারত সরকার এক লোক-দেখানো ভূমি-সংস্কার আরম্ভ করেছিল। বাইরের দিক থেকে এই ভূমি-সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল জমিদারী প্রথার অবসান করা। কিন্তু আসলে এই ভূমি-সংস্কারের ফলে জমিদারদের গায়ে আঁচড়ও লাগেনি। ১৯৫০ সালে এই নামমাত্র ভূমি-সংস্কার চালু করা হয়েছিল কেবল মাদ্রাজে। সুতরাং সব রাজ্যেই জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকের সংগ্রাম জোরের সঙ্গে চলতে থাকে। তেলেঙ্গানার পরেই এই আন্দোলন খুব জোরদার হয়ে ওঠে মাদ্রাজের অন্ধ্র অঞ্চলে।

অন্ধ্রের চাষী আর তেলেঙ্গানার চাষী এক ভাষাভাষী আর একে অন্যের জাতভাই। কাজেই তেলেঙ্গানার চাষীদের সংগ্রাম অন্ধ্রের চাষীদের সংগ্রামে উৎসাহ যুগিয়েছিল। তাই মাদ্রাজের কংগ্রেস সরকার নেহেরু-প্যাটেলের কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে তেলেঙ্গানার কৃষক সংগ্রাম ধ্বংস করবার জন্য অনুরোধ জানাল। কেন্দ্রীয় সরকারও বুঝেছিল যে, তেলেঙ্গানার এই সংগ্রামের আগুন অবিলম্বে নিবিয়ে ফেলতে না পারলে এ আগুন ছড়িয়ে পড়বে অন্ধ্রে, মাদ্রাজে, মহারাষ্ট্রে, বিহারে, উড়িষ্যায়—ভারতের সর্বত্র। সুতরাং ১৯৫১ সালে নেহেরু-প্যাটেলের এক বিরাট সৈন্য-বাহিনী নিজামকে দমনের অজুহাত নিয়ে প্রবেশ করল হায়দরাবাদে—তেলেঙ্গানায়। কেন্দ্রীয় সরকারের সৈন্য বাহিনী যখন হায়দরাবাদের সমস্ত অঞ্চল, এমনকি তেলেঙ্গানাও দখল করল, তখনও কৃষকদের গেরিলা-

বাহিনী তেলেঙ্গানায় পূর্ণোদ্যমে তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল নিজামের সৈন্য আর গুণ্ডা-বাহিনীর বিরুদ্ধে।

নেহেরু-প্যাটেল আর নিজামের মিলিত বিরাট সৈন্যবাহিনীও তেলেঙ্গানার সংগ্রামকে পিশে মারতে পারে নি। তেলেঙ্গানার কৃষকদের এই নতুন সংগ্রামকে, সামন্তপ্রথা-বিরোধী বিপ্লবকে ধ্বংস করল কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পিছন থেকে ছুরি মেরে। তেলেঙ্গানা-বিপ্লবকে ধ্বংস করবার এক চমৎকার উপায় খুঁজে বের করলেন তাঁরা। তখন সাধারণ নির্বাচন আসন্ন। ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের জন্য দেশের মধ্যে "স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে" একটি আবেদন প্রচার করলেন। এই আবেদন অনুসারে তেলেঙ্গানার কৃষকদের দীর্ঘ পাঁচ বছরের সশস্ত্র সংগ্রাম—ভারতের প্রথম সামন্ততন্ত্র-বিরোধী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব বন্ধ করা হল। বিপ্লবের প্রতি বিশ্বাসঘাতক রূপে দেখা দিলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তখনকার মত জয় হল বিশ্বাসঘাতকদের, সাময়িকভাবে বন্ধ হল তেলেঙ্গানার সংগ্রাম।

কিন্তু মরেনি তেলেঙ্গানা, বিশ্বাসঘাতকদের জাদুমন্ত্রে ঘুমিয়ে পড়েছিল মাত্র। আজ আবার সে জেগে উঠছে। সেদিন তেলেঙ্গানার সংগ্রাম পার্টির মধ্যে—সংগ্রামী জনসাধারণের মধ্যে একটি অসাধারণ তাৎপর্যপূর্ণ প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল: চীন-বিপ্লবের অর্থাৎ মাও সে-তুঙের পথ, না কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের আপসের পথ; তেলেঙ্গানার পথ, না বুর্জোয়া নির্বাচনের পথ; অর্থাৎ বিপ্লবের পথ, না একচেটিয়া বড়-বুর্জোয়া আর জমিদার-গোষ্ঠীর আইন-সভায় যোগদানের পথ—কোন পথে হবে শোষণ-উৎপীড়ন থেকে ভারতের শ্রমিক-কৃষকের মুক্তি, আসবে জনগণতন্ত্র, আসবে সমাজতন্ত্র। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সেদিন বিপ্লবের পথ ছেড়ে পার্টিকে, শ্রমিক-কৃষককে শেষ পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিল আইনসভার পথে অর্থাৎ ভোটের পথে। কমিউনিস্ট নেতৃত্বের এই চরম বিশ্বাসঘাতকতা ভারতের সংগ্রামী শ্রমিক-কৃষক

কোনদিন ভোলেনি। তাই এই বিশ্বাসঘাতকদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাদের মুখোস খুলে দিয়ে তেলেঙ্গানা আবার জেগে উঠেছে পরবর্তী কালের বিভিন্ন স্থানের কৃষক-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

বিপ্লব যত এগিয়ে যায়, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিও ততই সঙ্ঘবদ্ধ হয়, নতুন নতুন কৌশলে বিপ্লবকে বিপথে নিয়ে গিয়ে তাকে পরাস্ত করার চেষ্টা করে। তেলেঙ্গানা বিপ্লবের ক্ষেত্রেও হয়েছিল তাই। তেলেঙ্গানার সংগ্রাম দেখে আতঙ্কে দিশাহারা হয়ে বুর্জোয়া-জমিদারগোষ্ঠীও এই সংগ্রামকে বিপথে নিয়ে যাবার জন্য এক কৌশল বের করেছিল। এর জন্য তারা নিযুক্ত করেছিল ভারতের শ্রমিক-কৃষকের চরম শত্রু গান্ধীর এক প্রধান শিষ্য, বিনোবা ভাবে নামক এক ব্যক্তিকে। বিনোবা ভাবে কৃষি-বিপ্লবের পাল্টা পথ হিসাবে প্রবর্তন করলেন 'ভূদান-যজ্ঞ' বা 'ভূদান-আন্দোলন'। হায়দরাবাদ থেকেই এ আন্দোলনের প্রথম আরম্ভ। ১৯৫১ সালে কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা যখন তেলেঙ্গানা বিপ্লবের পিঠে ছুরি মারলেন, তার পরেই হায়দরাবাদে এসে দেখা দিলেন গান্ধীর শিষ্য বিনোবা। হায়দরাবাদেই তিনি তাঁর 'ভূদান-আন্দোলন' প্রথম আরম্ভ করলেন। এ এক মজার আন্দোলন—সত্যিকারের শয়তানী খেলা। ভূমিহীন কৃষকদের জমির জন্য সংগ্রামে বাধা দেওয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য।

বিনোবার এই আন্দোলনের মূল কথা এই যে, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা, জমিদারী প্রথা বজায় থাক, কিন্তু জমিদারগোষ্ঠী কিছু কিছু জমি দান করুক। সেই জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দিলে তারা আর সংগ্রামের পথে পা বাড়াবে না, তার ফলে তেলেঙ্গানার মত জমিদারী প্রথার কোনও ক্ষতিও হবে না। বিনোবা কৃষকদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, গান্ধীর অহিংসা আর শান্তিনীতি দ্বারাই ভারতের ভূমি-সমস্যার সমাধান হবে, অথচ জমিদারী প্রথাও বজায় থাকবে। এই আন্দোলন হায়দরাবাদ থেকে আরম্ভ করার একমাত্র কারণ ছিল এই যে, হায়দরাবাদের তেলেঙ্গানায়ই প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রাম চরম

আকার ধারণ করেছিল, আর সেই সংগ্রাম ভারতের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ধ্বংস অনিবার্য করে তুলেছিল।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতা নাম্বুদিরিপাদ, ভবানী সেন প্রভৃতিরা বিনোবা ভাবের এই আন্দোলন প্রকাশ্যেই সমর্থন করেছিলেন, তাঁরা বিনোবাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। এ থেকেই কমিউনিস্ট নেতাদের নির্বাচনের নাম করে তেলেঙ্গানার সংগ্রাম বন্ধ করার অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়। কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা যতই সংগ্রামের বিরোধিতা করুন, বিনোবা ভাবের দল জমিদারী প্রথাকে বাঁচাবার জন্য কৃষি-বিপ্লবের সংগ্রামকে বিপথে নেবার এবং বাধা দেবার যতই চেষ্টা করুন না কেন, তেলেঙ্গানার বিপ্লব, ভারতের কৃষি-বিপ্লব তথা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব এগিয়ে যাবেই, সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়বেই। ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় অনিবার্য।

তেলেঙ্গানা-সংগ্রামের একটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এই যে, তেলেঙ্গানার সংগ্রাম ছিল হায়দরাবাদের শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। শ্রমিকশ্রেণীই ছিল এই সংগ্রামের প্রধান চালিকা শক্তি। তেলেঙ্গানার সংগ্রাম একই সঙ্গে জমি ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম—ভারতের জনসাধারণের, কৃষকের আদর্শ সংগ্রাম। তেলেঙ্গানার এই সংগ্রামই ভারতে জনগণতন্ত্র স্থাপনের প্রথম প্রয়াস। সত্য বটে, এই সংগ্রাম সমগ্র ভারতের তুলনায় অতি-ক্ষুদ্র তেলেঙ্গানার গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; সত্য বটে, জন-গণতন্ত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এই সংগ্রামের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিকাশ লাভ করেনি। কিন্তু সবকিছু সত্ত্বেও তেলেঙ্গানাই ভারতের জনগণ-তান্ত্রিক বিপ্লবের প্রথম আহ্বান জানিয়েছে, প্রথম পথ দেখিয়েছে। তেলেঙ্গানা ভারতের কৃষি-বিপ্লবের আর তার সংগ্রামের অগ্রদূত। এখান থেকেই ভারতের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের আরম্ভ, তার প্রথম পদক্ষেপ। তাই তেলেঙ্গানা-সংগ্রাম ভারতের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়, ধ্রুবতারার মত, তা ম্লান হবে না কোনদিন।

১. তেলেঙ্গানার পরিচয়

মোগল শাসনের শেষভাগে, ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে মীর কামারুদ্দিন আসফ খাঁ নামে একব্যক্তি গোটা দক্ষিণ-ভারতের সুবাদার নিযুক্ত হয়েছিলেন। মোগল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ছিল তখন। এই সুযোগে ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে আসফ খাঁ নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করে বসলেন। এইভাবে কুখ্যাত নিজামের গোষ্ঠী ভারতের সবচেয়ে বড় সামন্তরাজ রূপে হায়দরাবাদের কৃষকদের ঘাড়ের উপর চেপে বসেছিল। তারপর এল ইংরেজরা। তারা এসে হায়দরাবাদের কৃষকদের আর গোটা ভারতের জনসাধারণের মহাশত্রু এই নিজামটাকে তাদের শাসন আর শোষণের সাকরেদ করে নিয়ে তার রাজ্যের আয়তন আরও বাড়িয়ে দিল। নিজাম আর বিদেশী ইংরেজরা ষড়যন্ত্র করে তেলেগু বা অন্ধ্রজাতীয়কৃষকদের দুইভাগে ভাগ করে বড় ভাগটা নিজামের রাজ্যের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। তেলেগু বা তেলেঙ্গা জাতীয় কৃষকদের বাস হায়দরাবাদের অর্ধেক জুড়ে। এই তেলেঙ্গা কৃষক, তেলেঙ্গা অধিবাসীদের নাম থেকেই হায়দরাবাদের পূর্ব অংশের নাম হয়েছে তেলেঙ্গানা দেশ। তেলেঙ্গানার অধিবাসীরা তেলেগু ভাষাভাষী হিন্দু, আর হায়দরাবাদের নিজাম অর্থাৎ রাজা হল উর্দু ভাষাভাষী মুসলমান। তেলেঙ্গানার আয়তন ইংলণ্ডের চেয়েও বেশী, লোকসংখ্যা প্রায় এককোটি, তারা প্রায় সবাই চাষী। তেলেঙ্গানার মধ্যে আটটি জেলা—ওয়ারাঙ্গাল, নালগোণ্ডা, মহবুবনগর, হায়দরাবাদ, মেদাক, নিজামাবাদ, করিমনগর আর আদিলাবাদ।

২. তেলেঙ্গানার শোষকগোষ্ঠী

তেলেঙ্গানার চাষীরা অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়নে জর্জরিত। তাদের মাথার উপর যে কত রকমের আইনী আর বে-আইনী ট্যাক্স চাপান ছিল তার হিসাব করা কঠিন। কত রকমের শোষক তাদের রক্ত জোঁকের মত শুষে নিত, তাদের উপর সাপের মত ছোবল মারত আর শকুনের মত তাদের মাংস ঠুকরে খেত। এই

শোষকগোষ্ঠীর প্রধান ব্যক্তিটি ছিল স্বয়ং নিজাম, তারপর জায়গীরদার, জমিদার আর দেশমুখের দল। জায়গীরদাররা হল বড় জমিদার। তেলেঙ্গানার প্রায় অর্ধেক ছিল তাদের দখলে। বাকি অর্ধেকের বেশীর ভাগ জমি দখল করে ছিল দেশমুখরা। তারা এক সময় ছিল নিজামের খাজনা আদায়কারী। তারপর নিজাম সরকার খাজনা আদায়ের ভার দেশমুখদের হাত অন্য-লোকের হাতে দেয়, আর তার বদলে দেশমুখরা প্রত্যেকে যথেষ্ট পরিমাণে উর্বর জমি লাভ করে নিজাম সরকারের কাছ থেকে। দেশমুখদের কেহ কেহ হাজার হাজার, এমন কি লক্ষ লক্ষ বিঘা জমির মালিক হয়েছিল। জনা রেড্ডি প্রতাপ রেড্ডি নামে একজন দেশমুখের অধিকারে ছিল ৩ লক্ষ ৬০ হাজার বিঘা জমি, মাধিরা তালুকের কালুর পরিবারের অধিকারে ছিল ২ লক্ষ ৪০ হাজার হাজার বিঘা, সূর্যপেটের দেশমুখের অধিকারে ছিল ৪৫ হাজার বিঘা।

এই ধরনের বড় দেশমুখ ছিল কেবল দু'চারজন নয়, অনেক। জাতপোলে নামে একজন বড় জমিদারের দখলে ছিল মহবুবনগর জেলার অর্ধেক, আর স্বয়ং নিজামের নিজ দখলে ছিল গোটা হায়দরাবাদ জেলার সমস্ত জমি। নিজামের নিজের জমির পরিমাণ ছিল ১ কোটি ৫০ লক্ষ বিঘা। ১৫ লক্ষ ভূমিদাস এই বিপুল পরিমাণ জমি চাষ করত। আর তা থেকে নিজামের বছরে আয় হত পাঁচ কোটি টাকা। তার উপরে স্টেট বাজেট থেকে নিজাম প্রতি বছরে যে ভাতা পেত তার পরিমাণ ছিল ৭০ লক্ষ টাকা। এ ছাড়া হায়দরাবাদের অধিকাংশ কল-কারখানার বেশীর ভাগ অংশেরও মালিক এই নিজাম বাহাদুর। নিজামের হীরামুক্তা আর সোনার অলংকারের দাম অন্তত পক্ষে ৬০০ কোটি টাকা।

নিজামের এই অমানুষিক শোষণ-শাসনের সাকরেদদের মোট সংখ্যা ছিল ১১০০। নিজাম তার এই ১১০০ সাকরেদদের সঙ্গে মিলে-মিশে শোষণ করত হায়দরাবাদের ১ কোটি ৭০ লক্ষ মানুষকে। এই ১১০০ জায়গীরদার আর দেশমুখের যে জমি

ছিল তার পরিমাণ ৯ কোটি বিঘা—রাজ্যের মোট জমির ৫ ভাগের ৩ ভাগ। এই ১১০০ সাকরেদদের মাত্র ১০টি পরিবারের বার্ষিক আয় ছিল ১০ কোটি টাকা। হায়দরাবাদের কৃষকদের মাথার উপর চাপান ছিল ৮০ কোটি টাকার ঋণ। আর সে ঋণ থেকে যে সুদ আদায় হত তার সবই যেত এই দশটি পরিবারের হাতে। এই হল ভারতের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সবচেয়ে বড় খুঁটি হায়দরাবাদের সামন্তগোষ্ঠীর শোষণের একটি সংক্ষিপ্ত হিসাব। এই শোষকগোষ্ঠীর কল্পনাতীত শোষণ-উৎপীড়নের বিরুদ্ধেই তেলেঙ্গানার চাষী উড়িয়েছিল বিপ্লবের লাল পতাকা, এদের তাড়িয়েই তেলেঙ্গানার চাষীরা ১ কোটি ৮ লক্ষ বিঘা জমি শোষণমুক্ত করেছিল, সেই শোষণমুক্ত অঞ্চলেই প্রতিষ্ঠা করেছিল ভারতের প্রথম জনগণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা, রীতিমত একটি জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

৩. কৃষক-শোষণের রূপ

কৃষকের মাথার উপর যে কত রকমের আইনী আর বে-আইনী ট্যাক্স চাপান ছিল তার সংখ্যা ঠিক করা কঠিন। একবার স্বয়ং নিজাম সরকারই দেশমুখ আর জায়গীরদারদের চাপান ৮৩ রকমের বে-আইনী আদায় বন্ধ করার হুকুম জারি করেছিল। অবশ্য সে হুকুম কাগজ-পত্তরেই থেকে গেছে, কোন দেশমুখ বা কোন জমিদারই তা মানেনি। তেলেঙ্গানার যারা প্রকৃত চাষী তাদের প্রায় অর্ধেকের কোন জমিজমা নেই। বাকি অর্ধেক চাষীর জমির পরিমাণ পাঁচ থেকে ত্রিশ বিঘা পর্যন্ত। এ জমিরও একটা অংশ 'ভেট' জমি। এই 'ভেট' জমির সমস্ত ফসল তুলে দিতে হত জমিদার আর নীচুস্তরের মালিকদের ঘরে। ধনী-কৃষকদের সংখ্যা ছিল শতকরা পাঁচ থেকে সাত। তাদের প্রত্যেকের জমির পরিমাণ ৪০ থেকে ৭৫ বিঘা পর্যন্ত। আর ছোটবড় জমিদারের সংখ্যা ছিল শতকরা ৩ থেকে ৫ জন। এদের বিভিন্ন নাম—দেশমুখ, বাঞ্জরদার সমস্থান প্রভৃতি। লক্ষ লক্ষ বিঘা চাষের জমি ছিল এদের অধিকারে।

প্রকৃত পক্ষে জমিজমার উপর সাধারণ চাষীদের কোন অধিকারই ছিল না। দেশমুখ আর জমিদারগোষ্ঠী অসংখ্য ট্যাক্সের দায়ে আর নানা ছলে চাষীদের সমস্ত ফসলই কেড়ে নিত। এমনকি মাথা গোঁজবার জন্য একখানা কুঁড়ে ঘর তুলতে হলেও জমিদারের অনুমতি নিতে হত, মোটা সেলামী দিতে হত। তেলেঙ্গানার চাষীরা এত দরিদ্র যে অধিকাংশই শুধু নেংটি পরে লজ্জা নিবারণ করে। ক্ষেত-মজুরদের খাটতে হত দিনে ১৪ ঘণ্টা করে। আগে আমাদের বাঙলাদেশের বর্গাচাষীরা ফসলের অর্ধেক পেত, কিন্তু তেলেঙ্গানার বর্গাচাষীদের তাও মিলত না। তার উপর নিজাম-জায়গীরদার-জমিদারদের জমিতে তাদের 'বেগার' খাটতেই হত।

তেলেঙ্গানায়, হায়দরাবাদের অন্যান্য অংশেও, কৃষক আর জনসাধারণের কোন রাজনৈতিক অধিকারই ছিল না। নিজামের পুলিস-মিলিটারী আর 'রাজাকার' নামে গুণ্ডাদল চাষীদের উপর অবাধে অত্যাচার চালাত, লুটপাট করত নিজামের সেই বর্বর "আইনের" নামে। এই অত্যাচার আর লুটপাট থেকে বাঁচবার একটি মাত্র উপায় ছিল, তা হল ঘুষ। প্রতিপদে ঘুষ দিয়ে বাঁচতে হত চাষীকে—সমস্ত মানুষকে।

৪. স্টেট কংগ্রেসের আন্দোলন

এই অমানুষিক অবস্থা চাষীদের সহ্যের বাঁধ ভেঙে দিল। চারদিকের আন্দোলন দেখে তারাও সংগ্রামের পথে পা বাড়াল। তেলেঙ্গানার চাষীদের মধ্যে বিক্ষোভ আর বিদ্রোহ দানা বাঁধতে লাগল। ১৯৩৮-৩৯ সালে প্রথম সেই বিক্ষোভ আর বিদ্রোহ ফেটে পড়ল। কিন্তু তখনও তেলেঙ্গানায় সেই বিদ্রোহ পরিচালনা করবার মত কোন নেতৃত্ব গড়ে ওঠে নি, তেলেঙ্গানার কমিউনিস্ট পার্টি তখনও তৈরী হয়নি। কিছুকাল আগে হায়দরাবাদে তৈরী হয়েছিল 'স্টেট কংগ্রেস'। এই 'স্টেট কংগ্রেসের' নেতৃত্ব ছিল ধনী-কৃষক আর অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ীদের হাতে। সেই 'স্টেট কংগ্রেস'ই নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কৃষকদের এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ

করল। ধনী-কৃষক আর ব্যবসায়ীরা চেয়েছিল নিজামের কাছ থেকে কিছু সুবিধা আদায় করতে। তাই কৃষকদের বিক্ষোভকে তারা চেয়েছিল নিজামের উপর চাপ দেবার জন্য ব্যবহার করতে। অন্যদিকে গরীব চাষী আর ক্ষেত-মজুরদের কোন অধিকার ও দাবি স্বীকার করতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না তারা। নিজামের বে-আইনী আদায় আর অত্যাচারের বিরুদ্ধেও কোন সংগ্রাম করার সাহস বা ইচ্ছা ছিল না তাদের। নিজামের সঙ্গে আপস-রফা করে কিছু সুবিধা আদায় করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। তাই তারা নিজাম-শাহীর উচ্ছেদ আর চাষীদের হাতে জমি দেবার দাবি তোলেনি কোনদিন। তাদের প্রধান রাজনৈতিক দাবি ছিল—"নিজামের অধীনেই দায়িত্বশীল সরকার চাই।" এই দাবি নিয়ে তারা সত্যাগ্রহ শুরু করল। চাষীরা এই শয়তানের খেলা দেখে এই সত্যাগ্রহ থেকে দূরে সরে দাঁড়াল। তারপর নিজামের পুলিস আর সৈন্যবাহিনীর তাণ্ডবে সে আন্দোলন ধ্বংস হয়ে গেল, তারপর 'স্টেট কংগ্রেস'কে বে-আইনী ঘোষণা করা হল।

৫. অন্ধ্র মহাসভার (সঙ্ঘম) জন্ম ও রূপান্তর

হায়দরাবাদের নিজাম উর্দু ভাষাভাষী মুসলমান, আর অধিকাংশ প্রজাই অন্য ভাষাভাষী হিন্দু। তবু উর্দুই হল হায়দরাবাদের সরকারী ভাষা। এমনকি শিশুদের শিক্ষাও চলত উর্দু ভাষায়। তাছাড়া সরকারের বেশী বেতনের সব পদগুলি ছিল মুসলমান জমিদারদের একচেটে। নাগরিক স্বাধীনতা বলতে কিছু ছিল না হায়দরাবাদ রাজ্যে। বিনা অনুমতিতে মিটিং করার অধিকার জনসাধারণের ছিল না। এই অবস্থার পরিবর্তনের উদ্দেশ্যেই এক সময় 'অন্ধ্র মহাসভা' (সঙ্ঘম) নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথমে শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারই ছিল এর দাবি। এরপর অন্ধ্র মহাসভা তেলেগু জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকারের দাবিও তুলতে থাকে। তখন তেলেগু ভাষাভাষী ধনী-কৃষক আর জমিদাররাই ছিল এর নেতা।

বে-আইনী ঘোষিত হবার পর 'স্টেট কংগ্রেস' প্রায় ভেঙে গিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল। 'স্টেট কংগ্রেসে'র সংগ্রামশীল অংশ তখন অন্ধ্র মহাসভায় প্রবেশ করল এবং একে কেন্দ্র করে আন্দোলন আরম্ভ করার জন্য প্রস্তুত হল। এরই সঙ্গে সঙ্গে 'স্টেট কংগ্রেসে'র কর্ম-পরিষদের সভ্য নারায়ণ রেড্ডি, ইয়েলো রেড্ডি এবং আরও কয়েক-জন বিপ্লবী কর্মী একত্রিত হয়ে পার্শ্ববর্তী অন্ধ্রের কমিউনিস্ট পার্টির সাহায্যে ও প্রেরণায় হায়দরাবাদের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা করলেন। এবার এই নতুন গড়া কমিউনিস্ট পার্টিই হল অন্ধ্র মহাসভার (সঙ্ঘমের) প্রাণস্বরূপ। কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগেই আন্দোলনের আয়োজন আরম্ভ হল তেলেঙ্গানায়। এই আন্দোলনের ভয়ে মহাসভার প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব মহাসভা থেকে সরে পড়ল।

৬. ১৯৪৪-৪৬ সালের সংগ্রাম

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত অন্ধ্র মহাসভা কৃষকদের মধ্যে সংগ্রামের আহ্বান ঘোষণা করল লক্ষ লক্ষ ইস্তাহারের মারফত। মহাসভার কর্মীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রচারকার্য চালাতে লাগল, সংগঠন গড়ে তুলল। সংগ্রামের ধ্বনি হল—জমিদার-রাজাকার-পুলিস-মিলিটারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও, জমি থেকে উচ্ছেদে বাধা দাও, বেগার আর বে-আইনী খাজনা দেওয়া বন্ধ কর। এই আপসহীন সংগ্রামের আহ্বান কৃষকদের মধ্যে প্রাণপণ সংগ্রামের দৃঢ় সংকল্প জাগিয়ে তুলল। দলে দলে কৃষকরা এসে সংগ্রামের পতাকা-তলে সমবেত হল। অল্পকালের মধ্যেই মহাসভার সভ্য-সংখ্যা দ্রুত বেড়ে গিয়ে হল দেড়লক্ষ।

১৯৪৪ সালের জুন মাস। নালগোণ্ডা জেলার 'জঙ্গম' তালুকের ৪০ খানি গ্রামের চাষীরা সমবেতভাবে এই অঞ্চলের কুখ্যাত দেশমুখ বিশ্‌নুরের বে-আইনী আদায় বন্ধ করে দিল। চাষীরা তাদের জমি দখল করে রইল, দেশমুখ তার গুণ্ডা-বাহিনী দিয়ে শতচেষ্টা করেও চাষীদের উচ্ছেদ করতে পারল না। তখনও সংগ্রামের বিশেষ কোন সংগঠন গড়ে ওঠেনি। তাই চাষীরা নিজ থেকেই দেশমুখের গুণ্ডাদলের

আক্রমণ রুখতে লাগল, এমন কি পাল্টা আক্রমণও চালাল। দেশমুখ পারল না তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে।

চাষীরা এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে সংগ্রাম আরও এগিয়ে নেবার দাবি করল। দেশমুখ পূর্বে যে সব জমি থেকে গুণ্ডা দিয়ে চাষীদের উচ্ছেদ করেছিল, সে সব জমি দখল করার দাবি উঠল। কৃষকরা তাদের হাতে অস্ত্র দেবার দাবিও জানাল কমিউনিস্ট পার্টির কাছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় পার্টি-নেতৃত্ব তাদের রাশ টেনে ধরল। তেলেঙ্গানার স্থানীয় পার্টি-নেতৃত্বও ভয় পেয়ে গেল। পার্টি-নেতারা আইনের সীমা ছাড়িয়ে যেতে তখনও প্রস্তুত ছিলেন না। এমনকি এই সময় নিজাম কৃষকদের কয়েকটি অধিকার মেনে নিয়ে কাগজ-পত্তরে যে ঘোষণা করেছিল তার সুযোগ নিতেও তারা ভয় পেয়ে গেলেন। কাজেই আন্দোলন আর এগিয়ে যেতে পারল না, বরং এক কদম পিছিয়ে গেল। কিন্তু এর ফল হল মারাত্মক।

দেশমুখের গুণ্ডাদলের হাতে মহাসভা আর কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা প্রচণ্ড মার খেতে লাগলেন। তারা ছলে-বলে তাদের গ্রেপ্তার করে তাদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাল। কংগ্রেসীরাও এসে গুণ্ডা আর পুলিসের সঙ্গে যোগ দিয়ে কমিউনিস্টদের উপর আক্রমণ চালাতে লাগল। একদিকে দেশমুখের গুণ্ডা আর পুলিস এবং অপরদিকে কংগ্রেসী গুণ্ডা—এই দুই দিকের আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে কমিউনিস্ট পার্টি আত্মরক্ষার জন্য গণ-ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলতে লাগল। সারা তেলেঙ্গানায়, বিশেষত নালগোণ্ডা জেলায় শত শত গ্রামের হাজার হাজার কৃষক যুবক এগিয়ে এসে এক নতুন ধরণের ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলল। বহু ছোট ছোট দলে, (স্কোয়াডে) তাদের ভাগ করে কমিউনিস্ট কর্মীরা গুণ্ডাদের আক্রমণ থেকে গ্রামগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করলেন।

১৯৪৬ সালের গোড়া থেকেই নিজামের পুলিস চাষীদের কাছ থেকে জোর করে বে-আইনী ট্যাক্স আদায় করতে আরম্ভ করে। এর ফলে বিভিন্ন স্থানে চাষীদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলতে থাকে। এই সময় জঙ্গম তালুকের মাচিরেড্ডিপল্লী গ্রামে গুণ্ডারা ১০টি স্ত্রীলোকের উপর

পাশবিক অত্যাচার করে। এর ফলে কৃষকদের বিক্ষোভ আগ্নেয় পর্বতের অগ্নি উদ্গারের মত ফেটে পড়ে চারদিকে। মহাসভা (সঙ্ঘম) আর কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা এই বিক্ষোভকে নিজাম-শাহীর বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক সংগ্রামের রূপদান করতে থাকেন। নিজাম সভাসমিতির উপর যে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল সেই নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অন্ধ্র আর তেলেঙ্গানার হাজার হাজার গ্রামে কৃষকদের সভা হয়। এই সব সভায় নিজামশাহীর বিরুদ্ধে আপসহীন সংগ্রামের দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করা হতে থাকে। এইভাবে অন্ধ্র আর তেলেঙ্গানার একজাতীয় জনসাধারণের মধ্যে সংগ্রামী মিলন গড়ে ওঠে। পূর্বেই সমস্ত অন্ধ্রজাতিকে মিলিত করে নিজামের শোষণ থেকে মুক্ত "বিশাল অন্ধ্র" গঠনের দাবি উঠেছিল। এবার নিজামশাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের মধ্যে সেই ঐক্যবদ্ধ 'বিশাল অন্ধ্র' গঠনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল।

১৯৩৬ সালের জুন মাসে বিশ্‌নুর দেশমুখ তার পোষা গুণ্ডা-বাহিনীকে লেলিয়ে দিল কৃষকদের উপর। কাদাভান্দি গ্রামে কৃষকেরা গুণ্ডাদের বাধা দিলে গুণ্ডারা কৃষকদের উপর গুলি চালাল। এই গুলি চালনার ফলে কামরাজ নামে একজন কমিউনিস্ট কর্মী নিহত হলেন। এই সংবাদ চারদিকে বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়লে হাজার হাজার কৃষক আর স্বেচ্ছাসেবক জড় হল ঘটনাস্থলে। তারা গুণ্ডাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাদের হাত থেকে বন্দুকগুলি কেড়ে নিল। গুণ্ডারা পালিয়ে গিয়ে স্থানীয় জমিদারের বাড়ীতে আশ্রয় নিলে কৃষকেরা জমিদারদের বাড়ী ঘিরে ফেলল, তারপর গুণ্ডাদের গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তি দিল। কৃষকদের এই সংগ্রাম প্রথমে আরম্ভ হয়েছিল নিজ থেকেই। তারপর কমিউনিস্টরা এগিয়ে এসে তাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন।

এই ঘটনা থেকে এক নতুন চেতনা দেখা দিল কৃষকদের মধ্যে। গুণ্ডাদের শাস্তি দিতে পেরে কৃষকদের মধ্যে সুপ্ত সংগ্রামী শক্তি জেগে উঠল। এরপর থেকে তারা হয়ে উঠল নতুন মানুষ, সামন্ততন্ত্র-

বিরোধী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান সংগ্রামী বাহিনী। বিদ্রোহী কৃষক হাজারে হাজারে কমিউনিস্ট পার্টি আর সঙ্ঘমের পতাকা নিয়ে জমিদার, দেশমুখ আর তাদের গুণ্ডাদল ও কর্মচারীদের তাড়িয়ে গ্রামের পর গ্রাম দখল করতে লাগল, প্রতি গ্রামের উপর উড়ন্ত লাল পতাকার লালরঙে আকাশ লাল হয়ে গেল। কৃষক সৈন্যের দল গ্রামের পর গ্রামে সঙ্ঘম (অন্ধ্র মহাসভা) প্রতিষ্ঠা করল, প্রত্যেক গ্রামের সব কৃষকই তাতে যোগদান করল, প্রতি-গ্রামে পঞ্চ-কমিটি (পঞ্চায়েত) গঠিত হল, প্রতি-গ্রামে যুবকদের নিয়ে তৈরী হল ভলান্টিয়ার-বাহিনী। পুলিস-মিলিটারী আর গুণ্ডাদলের আক্রমণ থেকে গ্রামগুলি রক্ষার জন্য গ্রামের চারদিকে কৃষক সৈন্যদের পাহারা বসল। পঞ্চায়েত গ্রহণ করল গ্রামের শাসনকার্য চালাবার সমস্ত ভার। নিজামের সামন্ততান্ত্রিক শোষণ-শাসনে জর্জরিত তেলেঙ্গানার চেহারা অতি দ্রুত পাল্টে যেতে লাগল। সামন্ততান্ত্রিক তেলেঙ্গানার পরিবর্তে গড়ে উঠতে লাগল কৃষকের, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক তেলেঙ্গানা।

এই ঘটনার ফলে কৃষকের সংগ্রামের দৃঢ়তা শতগুণ বেড়ে গেল। এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল শত শত গ্রামে। আপসহীন সংগ্রামের সঙ্কল্প নিয়ে কৃষকরা নিজেরাই এগিয়ে এসে গ্রামে গ্রামে সঙ্ঘম (অন্ধ্র মহাসভা) গড়ে তুলল। সঙ্ঘম আর কমিউনিস্ট পার্টির লাল পতাকায় গ্রামাঞ্চল ছেয়ে গেল। গ্রামে গ্রামে পঞ্চ-কমিটি (পঞ্চায়েত) তৈরী হল, জমিদারের বে-আইনী আদায় আর বেগার খাটান বন্ধ হয়ে গেল। কৃষকেরা গ্রাম থেকে দেশমুখ আর তাদের গুণ্ডাদের তাড়িয়ে দিল। গ্রামে গ্রামে কৃষকদের ভলান্টিয়ার-বাহিনী তৈরী হল, আর গুণ্ডাদের আক্রমণ থেকে গ্রামকে বাঁচাবার জন্য গ্রামের চারদিকে বসল ভলান্টিয়ারদের পাহারা। কমিউনিস্ট পার্টি আর সঙ্ঘম তখনও কমিস্টনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক পূরণচাঁদ যোশীর সংস্কারবাদী নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিল। তাই স্থানীয় পার্টি কৃষকের এই স্বতঃস্ফূর্ত সংগ্রাম পরিচালনা না করে বরং তার রাশ টেনে ধরল।

কৃষকরা পুলিস আর গুণ্ডাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবার জন্য অস্ত্র দাবি করল, কিন্তু পূরণচাঁদ যোশীর নির্দেশে কমিউনিস্টরা তাদের বাধা দিলেন।

এই সময় জঙ্গম তালুকে ধর্মপুরম অঞ্চলে কৃষকরা আর তাদের ভলান্টিয়ার-বাহিনী মিলে দেশমুখের কবল থেকে ১৫ হাজার বিঘা জমি উদ্ধার করল। এই জমি দেশমুখ অনেক আগে কেড়ে নিয়েছিল কৃষকদের হাত থেকে। সে অঞ্চলের কৃষকদের দমন করবার জন্য ছুটে এল সৈন্যদল। কিন্তু হাজার হাজার কৃষকের সমাবেশ আর সংগ্রামের দৃঢ়তা দেখে তারা দূর থেকেই সরে পড়ল।

পি. সি. যোশীর চক্রান্ত

কিন্তু কমিউনিস্টরা তখনও পূরণচাঁদ যোশীর দুষ্ট নেতৃত্বের প্রভাব থেকে মুক্ত হননি বলে তাঁরা কৃষকদের এই জমি দখল আর জঙ্গী সংগ্রামের বৈপ্লবিক তাৎপর্য বুঝতে পারলেন না। গ্রামাঞ্চল থেকে জমিদার আর দেশমুখদের, সৈন্য আর গুণ্ডাদের তাড়িয়ে তাদের শোষণের অবসান করার, গ্রামে গ্রামে স্বাধীন পঞ্চায়েত তৈরি করার বৈপ্লবিক তাৎপর্যও তারা বুঝতে পারলেন না। কৃষকরা নিজেরাই ধ্বনি তুলল—কৃষকের হাতে জমি চাই। কমিউনিস্টরা এই ধ্বনির সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যও বুঝতে পারলেন না বা বুঝতে চাইলেন না। যোশীর নির্দেশে তাঁরা চেষ্টা করলেন কৃষকদের এই স্বতঃস্ফূর্ত জঙ্গী সংগ্রামকে কেবল জমিদারের বে-আইনী আদায় আর বেগার খাটানোর বিরুদ্ধে সীমাবদ্ধ রাখতে।

কমিউনিস্টদের এই নিষ্ক্রিয়তা আর সংগ্রাম-বিরোধী মনোভাব নিজাম আর জমিদার-দেশমুখদের দৃষ্টি এড়াল না। তারা এই সুযোগে পাল্টা আক্রমণ শুরু করল। শত শত পুলিস তেড়ে এল কমিউনিস্ট নেতাদের গ্রেপ্তার করতে, বিদ্রোহী কৃষকদের দমন করতে। কমিউ-নিস্টরা কৃষকদের হাতে অস্ত্র না দিলেও তারা বীরের মত যুদ্ধ করল, বীরের মত প্রাণ দিল। তাদের যুদ্ধের অস্ত্র হল ভাঙ্গা ইঁট, কাঁচা বেল, পাথরের টুকরো, লঙ্কার গুঁড়ো, বাদিশাল নামে এক ধরনের বড়

গুলতি আর লাঠি ও তীর-ধনুক। পুলিস নাজেহাল হল কৃষকদের হাতে। এবার তেড়ে এল নিজামের সৈন্যবাহিনী। তাদের গুলি বর্ষণে বিভিন্ন গ্রামের মাঠ-ঘাট কৃষকদের রক্তে লাল হয়ে গেল। বহু কৃষকের সঙ্গে ২২ জন কমিউনিস্ট আর সঙ্ঘম কর্মীও প্রাণ দিলেন সেই সব যুদ্ধে। বর্বর সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে দু'জন কৃষক রমণীও নিহত হল। নালগোণ্ডা জেলার ৫০০ গ্রামের উপর সৈন্যদের অমানুষিক অত্যাচার চলল বহুদিন ধরে। বিভিন্ন গ্রামের কৃষকরা আবার অস্ত্রের দাবি জানাল কমিউনিস্টদের কাছে। এবার আর স্থানীয় কমিউনিস্টরা সে দাবী উপেক্ষা করতে পারলেন না। কারণ, তাঁদেরই হত্যা করবার জন্য জমিদারদের গুণ্ডারা চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাই পূরণচাঁদ যোশী ও কেন্দ্রীয় পার্টি নেতৃত্বের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও স্থানীয় কমিউনিস্ট কর্মীরা পুলিস আর গুণ্ডাদের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া বন্দুকগুলি তুলে দিলেন ভলান্টিয়ারদের হাতে—কিন্তু কেবল আত্ম-রক্ষার জন্য, আক্রমণের জন্য নয়।

আত্মরক্ষার তাগিদেই কমিউনিস্টরা কৃষকদের ভলান্টিয়ার-বাহিনীকেও ঢেলে সাজাতে আর সংগ্রাম-কৌশল বদলাতে বাধ্য হলেন। আত্মরক্ষার জন্য ভলান্টিয়ারদের ছোট ছোট 'স্কোয়াড' (৭/৮ জনের এক একটি দল) তৈরি হল। সৈন্য আর পুলিসদলের সঙ্গে যুদ্ধে কৃষকদের দলবেঁধে সামনাসামনি বাধা দানের কৌশল ত্যাগ করা হল। স্থির হল, সৈন্য আর পুলিসের বড় দল এলে তাদের ঘিরে ফেলে আক্রমণ করবে, তাদের অস্ত্র কেড়ে নেবে, আর গ্রামের কেউ শত্রুকে সাহায্য করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেবে। এইভাবে প্রকৃত গেরিলা-যুদ্ধ বা জনযুদ্ধের দিকে এক কদম এগিয়ে গেল তেলেঙ্গানার সংগ্রামী কৃষক।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান নেতা পূরণচাঁদ যোশী আর তাঁর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা নানাভাবে সংগ্রামের পথে বাধা সৃষ্টি করতে লাগলেন। এই সময় কৃষকদের চাপে স্থানীয় কমিউনিস্টরা জমিদারদের হাত থেকে জমি কেড়ে নেবার, বে-আইনীভাবে কেড়ে

নেওয়া জমি পুনর্দখলের, গরীব-চাষী আর ক্ষেত-মজুরদের মধ্যে জমি বিলি করার এবং খাজনা বন্ধ করার ধ্বনি তুলেছিল। যোশী কিন্তু কৃষকদের হুকুম দিলেন জমিদারকে খাজনা দেবার জন্য। যোশীর হুকুমে নিজাম-সরকারের কাছে একটি দাবিপত্র পেশ করে তাতে বলা হল যে, জমিদারদের বে-আইনী আদায় আর বেগার-প্রথা বন্ধ করাই কৃষকদের প্রধান দাবি। এ ছাড়া সেই দাবিপত্রে নিজামের অধীনে একটি দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠারও আবেদন জানানো হল। যোশী হুকুম দিলেন—সশস্ত্র সংগ্রাম, জমির দাবি আর নিজামের শাসনের অবসানের দাবি ত্যাগ করতে হবে, তার পরিবর্তে বুর্জোয়াদের 'স্টেট কংগ্রেসে'র সঙ্গে মিলে নিজাম যাতে ভারত য়ুনিয়ানে যোগ দেয় তার জন্য আন্দোলন করতে হবে। পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই চরম বিশ্বাসঘাতকতায় আন্দোলন কয়েক কদম পিছিয়ে গেল।

সংগ্রামের বৈপ্লবিক রূপান্তর

এদিকে নিজামের সৈন্যবাহিনী—পুলিস আর রাজাকার গুণ্ডা-বাহিনী একত্রে মিলে কৃষক ও কমিউনিস্ট কর্মীদের হত্যা, লুণ্ঠন, ঘরবাড়ী পোড়ানো আর স্ত্রীলোকের উপর পাশবিক অত্যাচার অবাধে চালিয়ে যাচ্ছিল। এরই সঙ্গে সঙ্গে নেহেরু-প্যাটেলের ভারত সরকারও তেলেঙ্গানার কৃষক-সংগ্রামকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করবার আয়োজন করল। কারণ, তারা বুঝতে পেরেছিল যে, হায়দরাবাদের এই কৃষক অভ্যুত্থান সফল হলে ভারতের সামন্ততন্ত্রের মূল ভিত্তিটাই ধ্বংস হয়ে যাবে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে নতুন প্রতিষ্ঠিত বড়বুর্জোয়া-জমিদারগোষ্ঠীর মিলিত শাসনও ধ্বসে পড়বে। তাই নেহেরু-প্যাটেলের সরকার নিজামকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার এবং নিজামশাহীকে জোরদার করবার জন্য নিজামের সঙ্গে এক চুক্তি করল। এই চুক্তিতে হায়দরাবাদের ভারত য়ুনিয়ানে যোগদানের প্রশ্নটি মুলতুবি রাখা হল, নিজামকে অস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করা হল এবং বাইরে থেকে তেলেঙ্গানার কৃষকরা

যাতে কোন সাহায্য না পায়, আর মাদ্রাজের অন্ধ্র অঞ্চলে কৃষকদের সংগ্রাম যাতে বিস্তার লাভ না করে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল।

এই সময়, অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে, কলিকাতায় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভা হয়। এই সভা থেকে যোশী-নেতৃত্বের তীব্র সমালোচনা করা হল, অবিলম্বে তেলেঙ্গানায় কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করবার এবং জমি দখল আর গরীব কৃষক ও ক্ষেত-মজুরদের মধ্যে জমি বিলি করবার জন্য হায়দরাবাদের কমিউনিস্টদের নির্দেশ দেওয়া হল। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতায় পার্টি-কংগ্রেস হয়। এই কংগ্রেস থেকেও হায়দরাবাদের কমিউনিস্টরা এই নির্দেশ লাভ করেন।

ইতিমধ্যে তেলেঙ্গানার কৃষক ও স্থানীয় কমিউনিস্টরা নিজামের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্যই পূরণচাঁদ যোশীর নির্দেশ অগ্রাহ্য করে সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করেছিলেন। নতুন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশ লাভ করার পর তারা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী নিয়ে পূর্ণোদ্যমে সশস্ত্র সংগ্রাম আরম্ভ করলেন। নতুন সংগ্রামের ধ্বনি হল:

(১) ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের প্রধান স্তম্ভ হায়দরাবাদ রাজ্য আর নিজামশাহীকে ধ্বংস কর; জনগণতান্ত্রিক 'বিশাল-অন্ধ্র' প্রতিষ্ঠিত কর।

(২) সকল জমিদারের জমি-জমা দখল কর, আর সেই জমি গরীব চাষীদের মধ্যে বিলি কর।

(৩) কৃষকের সমস্ত ঋণ অগ্রাহ্য কর।

(৪) গ্রামের সমস্ত দলিলপত্র পুড়িয়ে ফেল, গ্রামের সরকারী কর্মচারীদের পদত্যাগ করতে বাধ্য কর, প্রতি গ্রামে জমিদার আর তার দালালদের বাদে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক কৃষকের ভোটে 'গ্রাম-পঞ্চায়েত' নির্বাচিত কর।

(৫) নিজামের সৈন্যবাহিনী, পুলিস আর রাজাকার গুণ্ডাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রতি গ্রামে ভলান্টিয়ারদল গড়ে তোল, নিয়মিত গেরিলাদল তৈরী কর।

এবার নতুন পদ্ধতিতে সংগ্রাম আরম্ভ হয় ভোঙ্গির তালুকে পুলিগুল্লা জায়গীর থেকে। এই জায়গীরের কৃষকরাই প্রথম বিদ্রোহ করে জায়গীরদারের জমির উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। তাদের দমন করতে ছুটে এল নিজামের সশস্ত্র পুলিস আর রাজাকার গুণ্ডাদল। পুলিস আর রাজাকার বাহিনী প্রাণপণে গুলি বর্ষণ করল। কৃষকরা জঙ্গলের আড়াল থেকে তাদের 'বাদিশাল' নামক বড় গুলতি দিয়ে পাথরের টুকরো ছুঁড়ে আর দূর পাল্লার তীর-ধনুক দিয়ে তার জবাব দিতে লাগল। কৃষকদের মধ্যে হতাহত হল অনেকে। কিন্তু গুলতির পাথর আর তীরের আঘাতে প্রায় অর্ধেক সৈন্য সাংঘাতিক রূপে আহত হয়ে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে গেল। এই যুদ্ধে কৃষকেরা জয়লাভ করল তাদের বিপুল সংখ্যাশক্তি এবং যুদ্ধ-কৌশল আর গুলতি ও তীর-ধনুকের জোরে।

গ্রামের পর গ্রামে অতি দ্রুত এই নতুন সংগ্রামের কাহিনী প্রচারিত হল। স্থানীয় কথাকলি নাচ, নাটক আর যাত্রার মারফত কমিউনিস্ট কর্মীরা এই নতুন সংগ্রামের কথা গ্রামে গ্রামে পৌঁছে দিল। গ্রামে গ্রামে আরম্ভ হল সংগ্রামের এক নতুন অধ্যায়। ঘরে বাইরে যত রকমের হাতিয়ার ছিল তা নিয়েই দলবদ্ধ কৃষকেরা জায়গীর, জমিদারি আর পুলিস-রাজাকারদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে দিল। চারদিক থেকে এইভাবে আক্রান্ত হয়ে নিজামের বাহিনী গ্রামাঞ্চল ছেড়ে শহরে পালিয়ে গেল।

সংগ্রামী কৃষক নতুন করে পেল তার শক্তির স্বাদ। কিন্তু তারা বুঝল, নিজাম আর জমিদারগোষ্ঠী কখনই তাদের এই জয়, তাদের এই দাবি স্বীকার করে নেবে না; তাদের জয়কে তাদেরই শক্তির জোরে রক্ষা করতে হবে, নিজের শক্তির জোরেই তাদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তাদের মুক্তি সাধন করতে হবে। কমিউনিস্ট কর্মীরা তাদের শেখাল, মুক্ত গ্রাম ও অঞ্চলগুলিতে কৃষকদের নিজ শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, আর সেই শাসনে জায়গীরদার-জমিদারদের দ্বারা পূর্বে কেড়ে নেওয়া কৃষকদের জমি

বাজেয়াপ্ত করতে হবে; সঙ্গে সঙ্গে সেই জমি চাষীদের মধ্যে সুষ্ঠু-ভাবে বিলি করতে হবে, যারা সেই সংগ্রামে প্রাণ দিয়েছে আর ভবিষ্যতে প্রাণ দেবে তাদের পরিবার প্রতিপালনের ব্যবস্থা করতে হবে। ক্ষেত-মজুরদের মজুরি বাড়াতে হবে। নিজামের বাহিনীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা আর জমিরক্ষার জন্য গেরিলাবাহিনী ও নিয়মিত বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। নিজামের বাহিনীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে ও অন্যান্য উপায়ে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে, গ্রামাঞ্চলের সর্বত্র যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। এমনি হাজারো কাজ অবিলম্বে করতে হবে। কৃষকদের এই শিক্ষা আর উপলব্ধি থেকেই তেলেঙ্গানার গ্রামে গ্রামে গড়ে উঠতে লাগল জনগণের শাসন—জনগণতন্ত্রের ভিত্তি। এইভাবেই হল ভারতের মাটিতে প্রথম শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণের গণরাজের সূচনা।

নিজামশাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম

নিজামের বাহিনী ভাগ ভাগ হয়ে বিদ্রোহী গ্রামগুলির উপর আক্রমণ আরম্ভ করল। তাদের অস্ত্রশস্ত্র হল আধুনিক রাইফেল আর স্টেনগান। তারা নির্বিচারে নিরস্ত্র কৃষকদের হত্যা করতে লাগল, গ্রামের পর গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলল। নিজামের বিপুল সৈন্যবাহিনীর নিষ্ঠুর আক্রমণের সামনে দাঁড়াতে না পেরে কৃষকরা বুঝল, এই প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে আগের মত আর সম্মুখ-যুদ্ধ সম্ভব নয়। এই শত্রুর সঙ্গে লড়তে হলে চাই অস্ত্র। কিন্তু কোথা থেকে আসবে অস্ত্র? তারা দেশমুখ, জমিদার, রাজাকার প্রভৃতিদের কাছ থেকে যেসব অস্ত্র কেড়ে নিয়েছিল তা দিয়ে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত নিজামের সৈন্যবাহিনীকে উপযুক্ত আঘাত দেওয়া যাবে না। তাই তারা স্থির করল, নিজামের বাহিনী আর সশস্ত্র গুণ্ডাদের হঠাৎ আক্রমণ করতে হবে, হঠাৎ আক্রমণে তাদের পরাস্ত করে তাদের অস্ত্র কেড়ে নিতে হবে, আর তাই দিয়ে নিজেদের সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এমনি করে কমিউনিস্ট কর্মীদের নেতৃত্বে বিদ্রোহী কৃষকরা নিজেদের সৈন্যবাহিনীর জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করতে লাগল।

যেসব অস্ত্র তাদের হাতে ছিল তাই নিয়ে কৃষক-সৈন্যরা শত্রুর উপর ঝাপিয়ে পড়ে শত্রুদের মেরে তাদের অস্ত্র কেড়ে নিতে লাগল। এই তো হল জনযুদ্ধে জন-বাহিনীর যোদ্ধাদের অর্থাৎ গেরিলাদের অস্ত্র সংগ্রহের চিরকালের নীতি!

এইভাবে ক্রমশ গড়ে উঠতে লাগল এক নতুন সংগ্রাম—ভারতের গণ-সংগ্রামের ইতিহাসে যার কোন তুলনা নেই। একদিকে, গ্রামের উপর শক্তিশালী নিজাম-বাহিনীর আক্রমণ হলে গ্রামের পুরুষেরা লুকিয়ে গ্রামের বাইরে চলে যেত। এই সুযোগে নিজামের সৈন্য আর গুণ্ডারা চাষীর শস্য লুট করত, গরু-মোষ কেড়ে নিত, নারী আর শিশুদের উপর বীভৎস অত্যাচার করত, গ্রাম জ্বালিয়ে দিত; আর একদিকে, নতুন নতুন গ্রামের উপর সগৌরবে মুক্তির নিশান উড়ত, সশস্ত্র গ্রামরক্ষীরা নিজামের সৈন্য আর গুণ্ডাদের উচিত শিক্ষা দিয়ে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিত, নিহত বা আহত সৈন্যদের অস্ত্র হস্তগত করত, দেশমুখ আর জমিদারদের জমি দখল করে গরীব-চাষীদের মধ্যে বিলি করত। এছাড়া সশস্ত্র গেরিলাদল নিজামের ছোট ছোট সৈন্যদলের উপর হঠাৎ আক্রমণ করে তাদের মনে ত্রাস সৃষ্টি করত, তাদের অস্ত্র দখল করত। নিজামের বড় বড় সৈন্যদল আক্রমণ করলে গ্রামের সমস্ত লোক পালিয়ে যেত, শত্রুসৈন্য চলে গেলে সবাই ফিরে এসে গ্রামের উপর আবার প্রতিষ্ঠা করত তাদের অধিকার।

এমনি করে মুক্ত গ্রামের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যেতে লাগল। ক্রমে ক্রমে হায়দরাবাদের মোট ২২ হাজার গ্রামের মধ্যে আড়াই হাজার গ্রামেই নিজামের শাসনের বিরুদ্ধে কৃষক-সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ল, আর সেখানে উড়ল কৃষকের মুক্তির লাল পতাকা। তার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠল মুক্ত অঞ্চলে এক নতুন শাসন-ব্যবস্থা আর সেই মুক্ত অঞ্চলের গণফৌজ। সেই নতুন শাসন-ব্যবস্থাই ভারতের **প্রথম জনগণতন্ত্র**। গণফৌজের নাম হল তেলেগু ভাষায় 'দলম'। প্রতি গ্রামেই নিজামের বাহিনীর সঙ্গে গণফৌজকে অসীম বীরত্বের

সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। সেই সব যুদ্ধের কাহিনী নিয়েই রচিত হয়েছে তেলেঙ্গানা-বিপ্লবের ইতিহাস। কয়েকটি মাত্র কাহিনী সংক্ষেপে দেওয়া হল এখানে :

সিদ্দিপেট তালুকের জেগিদপুরম গ্রামে সশস্ত্র রাজাকার বাহিনী ঢুকে লুটপাট, হত্যাকাণ্ড, ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া প্রভৃতি সবকিছু করতে আরম্ভ করেছে। একদিন নয়, কয়েকদিন ধরে চলেছে এই ধ্বংস-কাণ্ড। একদিন গ্রামের সমস্ত পুরুষ মিলে হঠাৎ তাদের আড্ডা আক্রমণ ক'রে ১৫ জন রাজাকারকে মেরে ফেলল, আর তাদের অস্ত্রগুলি দখল করল। তারপর সেই অস্ত্র নিয়েই তারা বাকি রাজাকারদের শেষ করল। এইভাবে পাওয়া ৩০টি বন্দুকই হল এই গ্রামের গণফৌজের প্রধান হাতিয়ার। এই হাতিয়ার দিয়েই গ্রামের গণফৌজ পরে নিজামের অনেক সৈন্য আর রাজাকার মেরেছিল, আরও বহু অস্ত্র তারা সংগ্রহ করেছিল।

পিলিয়াপল্লী গ্রামের উপর আক্রমণ করেছে ৮০ জন নিজামী সৈন্য। শত্রুর শক্তি দেখে গ্রামের গণফৌজের ছোটদলটি গ্রামের বাইরে পালিয়ে গেল। গ্রামে যারা রইল তারা মুখ বুজে সব অত্যাচার সহ্য করল। নিজামী সৈন্যরা সারা দিন অবাধে লুটপাট করে চারখানি লড়িতে সব লুটের মাল ভর্তি করল। ২০ জন সৈন্যের উপর লড়িগুলি নিয়ে যাবার ভার দিয়ে বাকি সব সৈন্য চলে গেল। মাত্র ২০ জন সৈন্য লড়ি পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে—এ খবর গণফৌজের কাছে অবিলম্বে পৌঁছে দিল গ্রামের লোকেরা। গণফৌজের সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ল লড়িগুলির উপর। ২০ টা নিজামী সৈন্যই নিহত হল তাদের হাতে। গণফৌজ পেয়ে গেল তাদের হাতের ১৮ টা রাইফেল আর দু'টা স্টেনগান। লুটের মালভর্তি লড়িগুলো নিয়ে তারা গ্রামে ফিরে এল। এইসব অস্ত্র দিয়েই গ্রামের গণফৌজ পরে বহু লড়াই করেছিল, আরও বহু অস্ত্র তারা সংগ্রহ করতে পেরেছিল।

নালগোণ্ডা জেলার আপ্পালিপেট গ্রামের পুরুষেরা একদিন সবাই

গেছে কোন কাজে গ্রামের বাইরে। এই সংবাদ পেয়েই ৫০ জন সশস্ত্র পুলিস নিয়ে জমিদার হঠাৎ গ্রাম আক্রমণ করল। তারা এসেই অন্ধ্র মহাসভার চারজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করল। তারপর তারা কৃষকদের বাড়ী লুট আর মেয়েদের ইজ্জৎ নষ্ট করার চেষ্টা করতেই গ্রামের সব মেয়েরা উদুখলের ডাণ্ডা, বাদিশালা নামক বড় গুলতি আর লঙ্কার গুঁড়ো নিয়ে আক্রমণ করল জমিদার আর সশস্ত্র পুলিসদের উপর। চোখে লঙ্কার গুঁড়ো ছুঁড়ে দিয়ে আর গুলতির বড় বড় গুলি মেরে তারা বহু পুলিসকে ঘায়েল করল, তারপর ডাণ্ডা দিয়ে পিটিয়ে আধমরা করে ফেলল পুলিসগুলোকে। ৩০টা পুলিস ঘায়েল হল এইভাবে, আর বাকি ২০টা পুলিশ গুলতিতে জখম হয়ে ছুটে পালাল। ইতিমধ্যে গ্রামের পুরুষরা এসে পুলিশ-গুলোর বন্দুক কেড়ে নিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিল গ্রাম থেকে।

সমস্ত সংগ্রামই যে সফল হত তা নয়। বহু ক্ষেত্রে গণফৌজের বীর যোদ্ধাদের অনেককে প্রাণ দিতে হয়েছিল। কিন্তু তাঁদের বীরত্ব আর আত্মত্যাগ তেলেঙ্গানার কৃষক ভুলে যাবে নাকোনো দিন। একদিন এলিকাট্টে গ্রামে নিজামী সৈন্যদের একটা বড় দল এসে হঠাৎ ঢুকেই ছয়জন গ্রামবাসীকে গ্রেপ্তার করল, তারপর তাদের হাত-পা বেঁধে এক সারিতে দাঁড় করিয়ে এক এক করে গুলি করে হত্যা করল। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁরা চিৎকার করে বলল —'সঙ্ঘম কি জয়', 'কমিউনিস্ট পার্টি কি জয়'।

করিমনগর জেলার মন্দপুরম গ্রামে একদিন গণফৌজের একটি ছোট দল এসে পৌছুল। গ্রামবাসীরা তাদের অভ্যর্থনা করতে ব্যস্ত। এমন সময় ১২০ জন নিজামী সৈন্য এসে গ্রাম আক্রমণ করল। গণফৌজের ছোটদলটি এমনি করে ঘেরাও হয়ে প্রথমে যুদ্ধ এড়াবার চেষ্টা করল। তারা দুই দলে ভাগ হয়ে গেল। তাদের ছোটদলটি শত্রুকে বাধা দিতে লাগল, আর বড় দলটি গ্রাম থেকে সরে পড়ল। ৯ জনের ছোট দলটি সমস্ত শক্তি দিয়ে বাঁধা দিতে লাগল শত্রুদের। তাদের নেতা প্রভাকর রাও সঙ্গীদের নিয়ে ক্ষত-

বিক্ষত দেহে চারঘণ্টা ধরে যুদ্ধ করলেন শত্রুদের সঙ্গে। যুদ্ধ করতে করতে প্রভাকর এবং আরও সাতজন যোদ্ধা শত্রুপক্ষের গুলিতে প্রাণ দিলেন। তাঁদের বন্দুকের গুলি-বারুদ ফুরিয়ে গিয়েছিল, বাকি ছিল কেবল একটি হাতবোমা। সেটিও ছুঁড়ে দিলেন তাঁরা। বোমার ঘায়ে ছয়জন শত্রুসৈন্য নিহত হল। তারপর সবাইকে নিয়ে প্রভাকর শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, বন্দুকের বাঁট দিয়ে কয়েকটাকে শেষ করে অবশেষে শত্রুদের গুলিতে বীরের মত প্রাণ দিলেন তাঁরা সবাই।

ভোঙ্গির তালুকের রেণুকুন্তালু গ্রামের উপর রাইফেল ও স্টেনগান-ধারী ৩০০ জন পুলিস আর রাজাকার গুণ্ডা আক্রমণ করায় সব গ্রামবাসী পালাতে পারল না, আক্রমণকারীদের হাতে ১০ জন গ্রামবাসী নিহত হল। আক্রমণকারীরা অন্য সব লোককে খুঁজে বেড়াতে লাগল। কিছু দূরেই ছিল গণফৌজের ছোট একটি দল। নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যার সংবাদ শুনে তারা চুপ করে থাকতে পারল না। তারা ছিল সংখ্যায় মাত্র ২০ জন, তাদের নেতা ছিলেন চিন্তলাপুরি রামা রেড্ডি। রামা রেড্ডির নেতৃত্বে এই ছোট গেরিলাদলটি রুখে দাঁড়াল আক্রমণকারীদের সামনে। তারা সাত ঘণ্টা ধরে যুদ্ধ করে আক্রমণকারীদের ৪০ জনকে ঘায়েল করল। কিন্তু সাত ঘণ্টার যুদ্ধের পর তাদের গুলিবারুদ ফুরিয়ে গেল। তারা শেষ পর্যন্ত তাদের বন্দুকের বাঁট দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিল ২০ জনেই। কেবল এই একটি যুদ্ধেই নিজামের বাহিনীকে ১০ হাজার রাউণ্ড গুলি চালাতে হয়েছিল। চিন্তলাপুরি রামা রেড্ডি আর তাঁর ছোট গেরিলা দলটির এই অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের কাহিনী তেলেঙ্গানা সংগ্রামে অফুরন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার উৎসে পরিণত হয়েছে, নতুন নতুন মানুষকে টেনে এনেছে। তেলেঙ্গানার বহু গাঁথায় কীর্তিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে চিন্তলাপুরি রামা রেড্ডির অমর নাম।

গেরিলা-যুদ্ধের কাহিনী

১৯৪৯ সালের শেষদিকে একজন দরদী সাংবাদিক (রমেশ থাপার) তেলেঙ্গানার মুক্ত-অঞ্চল ঘুরে ঘুরে নিজের চোখে সব দেখেছিলেন, তারপর সেখানকার অবস্থা আর গেরিলা-যোদ্ধাদের সংগঠন আর কায়দা-কানুন সম্বন্ধে 'ব্লিৎস' পত্রিকায় একটি বিবরণ লিখেছিলেন। বিবরণটি নিচে তুলে দেওয়া হল :

"খবরের কাগজে তেলেঙ্গানা সম্বন্ধে অনেক কথা শোনা যায়। রোজই হায়দরাবাদ রেডিও খবর দেয়, লড়াইয়ে কমিউনিস্টরা দলে দলে মরছে। অধ্যাপক রঙ্গ এই সংগ্রামের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার ক'রে বলেছেন, ভারতে তেলেঙ্গানায়ই চীনের মত গৃহযুদ্ধের সূচনা হচ্ছে। কমিউনিস্টরা দাবি করেছে, নালগোণ্ডা, ওয়ারাঙ্গাল, কাশিমনগর, আত্রাফ্ বাদলা আর আদিলাবাদ জেলায় ২৫০০ গ্রাম থেকে তারা নিজামতন্ত্রের সমস্ত চিহ্ন নিঃশেষে মুছে ফেলেছে। নালগোণ্ডা আর ওয়ারাঙ্গাল তাদের প্রধান ঘাঁটি।

"ভারত সরকারের 'রাজাকার' সংগঠন ভেঙে ফেলার গুরুত্বপূর্ণ দাবির উত্তরে নিজাম জানিয়েছেন যে, কমিউনিস্ট বিপদ বর্তমান থাকতে ও-বিষয়ে কিছু করা সম্ভব নয়। বোম্বাইয়ের সাংবাদিক-সম্মেলনে পণ্ডিত নেহেরু জানিয়েছেন, কমিউনিস্টদের হাতে পড়বে বলে হায়দরাবাদের জনসাধারণের হাতে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া যাচ্ছে না। আসলে তেলেঙ্গানার ছবি যে ভারত-নিজাম আপস-আলোচনার পেছনে সব সময় ভ্রূকুটি করছে তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু কে এই যোদ্ধারা যারা একই সঙ্গে সর্দার প্যাটেল, নেহেরু আর নিজামের গুরুতর দুর্ভাবনার কারণ হয়েছে, তাঁদের আহার নিদ্রা ত্যাগ করতে হয়েছে ?

আড়াই হাজার গ্রামে নিজামশাহীর অবসান : "তেলেঙ্গানার আড়াই হাজার গ্রামের বিরাট অঞ্চলে প্রবেশ করা সহজ ব্যাপার নয়। কমিউনিস্টদের ধরার ব্যাপারে নিজামের অনুচরগণ, ভারত সরকারের পুলিস আর গোয়েন্দারা সমান উৎসাহী।

আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট নেতাদের ধরবার জন্য দুই পক্ষের একযোগে কাজ করার টাটকা বিবরণ সব সময়েই পাওয়া যাবে। কাজেই আমাদের অনেক দূর পায়ে হেঁটে আর গোরুর গাড়ীতে করে গেরিলাদের দখল-করা অঞ্চলের মাঝখানে পৌঁছাতে হল। আমাদের রক্ষী হিসাবে সঙ্গে ছিল দেশী বন্দুকধারী একদল গেরিলা।

"এখানে জীবনযাত্রা স্বাভাবিকভাবেই চলেছে, বীজ বোনার জন্য ক্ষেত-খামার তৈরী হয়েছে। চাষীরা ক্ষেতে গরু-বাছুর প্রভৃতি চরিয়ে বেড়াচ্ছে। সব লোক যে যার কাজ করছে, স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করছে। অবস্থার গুরুত্বটা কেবল বোঝা যায় সকলের সজাগ দৃষ্টিতে আর মুখের বজ্রকঠিন দীপ্তিতে। আড়াই হাজার গ্রামে এরা নিজাম-শাহীর সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলেছে।

"নিজাম-সরকারকে এককণা ফসল বা এক পয়সাও কর এখান থেকে দেওয়া হয় না। স্থানীয় পাটোয়াররা হয় পালিয়েছে, না হয় জনসাধারণের পক্ষে চলে এসেছে। কিন্তু নিজাম তার কর্তৃত্ব পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তলোয়ার আর আগুনের নারকীয় তাণ্ডব শুরু করেছে। তাই মুক্ত তেলেঙ্গানার একটুও বিশ্রাম নেই।—সর্বত্রই তাদের রণক্ষেত্র, সকল সময়ই যুদ্ধ। এই নতুন পাওয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাই প্রতিটি গ্রামে চব্বিশ ঘণ্টাই সজাগ থাকতে হয়। এই বিরাট রণক্ষেত্রে প্রতিদিন, প্রতি ঘণ্টায় গণফৌজ 'দলম'-এর সঙ্গে নিজামের পুলিস, সৈন্যদল আর 'রাজাকার' গুণ্ডাদের লড়াই চলেছে।

জনযুদ্ধের কায়দা ঃ " 'দলম' বলতে বোঝায় ছোট ছোট সশস্ত্র দল। ভারতের গণ-সংগ্রামে এ এক নতুন জিনিস। সামন্ততান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতা লোপ এবং অত্যাচারী দস্যুদলের আক্রমণ রোধ করবার জন্য এক অব্যর্থ উপায় হল এই সশস্ত্র বাহিনী ; আমি এই 'দলম'-এর শিক্ষা ও সংগঠনের যতটুকু দেখেছি তার অনেক কথাই এখন বলা সম্ভব নয়। কারণ, তাতে শত্রুপক্ষের সুবিধা হয়ে যাবে। কাজেই যেটুকু বলা চলে তাই এখানে বলছি।

"একটি গ্রামের এক মাইল দূরের এক পাহাড়ে 'দলমের' এক

আড্ডায় আমরা পৌঁছালাম। তখন ঘোর সন্ধ্যা। সেখানে দেশী বন্দুক হাতে খাকি পোশাকপরা একশো জন যুবককে দেখতে পেলাম। শত্রুর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া কয়েকটি রাইফেল আর একটি স্টেনগানও পরে দেখেছিলাম।

"এই দলের নেতা ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন তরুণ গ্রাজুয়েট। নিজে ধনী কৃষক-পরিবারের ছেলে হলেও তিনিই প্রথম এই অঞ্চলের নতুন জমি বিলির আইন অনুসারে নিজের শত শত বিঘা জমি বিলি করে দিয়েছেন কৃষি-মজুরদের মধ্যে। তাঁর রাজনৈতিক জ্ঞান আর হাতের অব্যর্থ লক্ষ্য তাঁকে নেতার পদে বসিয়েছে। এই গেরিলা দলটির সঙ্গে আমি ছিলাম তিন সপ্তাহ। এই সময় তাঁর কাছ থেকেই আমি 'দলমে'র গঠন, এর যুদ্ধের কায়দা আর কর্মসূচী জানতে পেরেছিলাম।

"তেলেঙ্গানার সংগ্রাম-পদ্ধতি অবস্থাভেদে স্থির করা হয়। তিন বছর আগে জনসাধারণ গ্রামে গ্রামে লাল নিশান পুঁতে দলে দলে সঙ্ঘমের সভ্য হয়েছিল। তারা প্রতিজ্ঞা নিয়েছিল, দেশমুখ আর জায়গীরদারদের কাছে তারা বেগার খাটবে না, বে-আইনী কর দেবে না। আইন ছিল তখন চাষীদেরই পক্ষে। কিন্তু দেশমুখদের সশস্ত্র গুণ্ডারা তাদের সঙ্গে প্রকাশ্যে মারপিট করতে লাগল আর দিন-দুপুরে তাদের নেতা কুমারায়াকে খুন করল। সেই দিনই পাঁচ হাজার কৃষক একত্র হয়ে গুণ্ডাদের পিটিয়ে গাঁ-ছাড়া করল। এই প্রথম জনসাধারণ নিজের শক্তির মূল্য বুঝল। তারা আরও বুঝল যে, শত শত বছর ধরে চলে আসা অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে হলে এই শক্তির ব্যবহার অবশ্যই করতে হবে।

"কিন্তু পুরানো চিনে জোঁক এত সহজে হার মানতে পারে না। দেশমুখের গুণ্ডারা গেল তো নিজামের সশস্ত্র পুলিস এল। কৃষকেরা তীর-ধনুক আর গুলতি হাতে আত্মরক্ষা করল। এর পর পুলিস এসে গ্রামে গ্রামে তাঁবু ফেলল। তবে দেশমুখরা ফিরে এসে আর আগের মত শোষণ চালাতে পারেনি। অত্যাচার, গ্রেপ্তার আর কয়েদের ফলে কৃষকরাও চাষবাস করতে পারল না।

"এই অবস্থার শীঘ্রই পরিবর্তন হল। ১৯৪৭ সালে সমগ্র হায়দরাবাদ রাজ্যে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল, তাতে কৃষকরা প্রায় বিনা-অস্ত্রেই দল বেঁধে গ্রামের পুলিস ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করত, তাদের অস্ত্র কেড়ে নিত। এইভাবেই তারা প্রথম অস্ত্র সংগ্রহ করল। এইসব আক্রমণের ফলে গ্রামাঞ্চল থেকে পুলিস-ঘাঁটিগুলি উঠে গেল। দেশমুখরা হায়দরাবাদ থেকে সৈন্যবাহিনী, পুলিসবাহিনী আর 'রাজাকার' গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে এল। এরপর শুরু হল এদের বীভৎস অত্যাচার-উৎপীড়ন, লুণ্ঠন, বলাৎকার প্রভৃতি। এর ফলে স্পষ্টভাবে গ্রামাঞ্চল দুইটি যুদ্ধমান শিবিরে ভাগ হয়ে গেল—একভাগ হল সৈন্য-পুলিস-রাজাকার-গুণ্ডাবাহিনী, আর একভাগ হল সশস্ত্র কৃষকগণ।

"জনসাধারণ তাদের মুক্ত, স্বাধীন অঞ্চলের সীমানা বাড়াতে লাগল। যেসব জমিদার আর জায়গীরদার সরকারের সাহায্যে নারী-ধর্ষণ, লুট, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি চালিয়েছে, তাদের জমিজমা ও সম্পত্তি কৃষকেরা দখল করে নিল। জমি, স্বাধীন জীবন, মেয়েদের ইজ্জৎ রক্ষার জন্য তারা গ্রামের সক্ষম ব্যক্তিদের নিয়ে দল গঠন করল, ২৪ ঘণ্টা গ্রাম পাহারা দিতে লাগল। এইভাবেই হল 'দলম'-এর উৎপত্তি।

"আক্রমণকারীরা এবারে একসঙ্গে একশো, দু'শো, পাঁচশো এসে হানা দিতে লাগল। সুতরাং এদের প্রতিরোধের জন্য নতুনভাবে 'দলম'কে ঢেলে সাজান হল। প্রতি গ্রামে একটি করে 'দলমের' পরিবর্তে অনেকগুলি গ্রামের দক্ষ আর সবচেয়ে সাহসী যুবকদের নিয়ে এবং ভাল ভাল অস্ত্র দিয়ে এক-একটি দল গড়া হল। এই দলগুলিকে গড়ে তোলা হল ঠিক সামরিক কায়দায়। এদের নিয়মিত সামরিক শিক্ষা—কুচ-কাওয়াজ প্রভৃতি শেখানো হল, আর প্রত্যেক দলের মধ্যে যোগাযোগ-ব্যবস্থা গড়ে তোলা হল।

"আমি যে দলের সঙ্গে ছিলাম সেই দলটি নতুন গড়ে তোলা হয়েছে। এই দলের নেতা একজন ধনী কৃষকের শিক্ষিত পুত্র হলেও ছোট ছোট দলের নেতারা প্রায় সবাই তরুণ কৃষক। নেতাদের মধ্যে

কয়েকজন মুসলমানও ছিল। 'দলমে'র অধিকাংশ সৈন্যই কৃষি-মজুর আর গরীব কৃষকের ছেলে। এরাই হল 'দলম', সঙ্ঘম আর নতুন তৈরি করা জনগণের শাসন-ব্যবস্থার প্রধান শক্তি, প্রথম থেকে এরাই রয়েছে সমস্ত লড়াইয়ের সামনের সারিতে।

দলম-সঙ্ঘম ও গণ-শাসন-ব্যবস্থা ঃ "কেন্দ্রীয় গেরিলা-বাহিনীতে সৈন্য ভর্তি করা হয় অনেক বাছাই করে। গ্রামের সব যুবকই এই বাহিনীতে যোগ দিতে চায়, কিন্তু নেওয়া হয় কেবল কষ্ট-সহিষ্ণু আর অত্যন্ত বিশ্বাসী লোককে। যাদের বাদ দেওয়া হয় তাদের বলা হয়, তারা যেন নিজ নিজ গ্রামের 'দলমে' কাজ করে তাকে শক্তিশালী করে তোলে। তাদের বাদ দেবার কারণ, 'দলমে'র জীবন-যাত্রা অত্যন্ত কঠোর। এই বাহিনীকে সব সময় থাকতে হয় লড়াইয়ের ময়দানে, সব সময় চলতে হয় এদের। নিজামের সশস্ত্র-বাহিনীর একমাত্র কাজ হল কেন্দ্রীয় 'দলমের' বিভিন্ন গোপন ঘাঁটি খুঁজে বের করা, তাদের ঘেরাও করে ধ্বংস করে ফেলা। কাজেই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সব সময় সতর্ক থাকতে হয়। 'দলমে'র গুপ্ত-চরদের রাখা হয়েছে শত্রুর গতিবিধির সন্ধান রাখার কাজে। 'দলম' যেখানে কয়েক ঘণ্টার জন্যও বসে বিশ্রাম করে সেখানেও চারদিকে সতর্ক পাহারা বসে।

"এই তরুণ বাহিনীর প্রতিদিনের কর্মসূচী আছে। খুব ভোরে উঠে এরা প্রতিদিন দু'ঘণ্টা ড্রিল আর কুচ-কাওয়াজ করে। এসবের মধ্য দিয়ে আনাড়ি কৃষক তরুণ বিপ্লবী গেরিলা-সৈন্যরূপে গড়ে ওঠে [illegible] অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের শিক্ষা। কিন্তু রণ-ক্ষেত্রই গেরিলা যোদ্ধার [illegible] শিক্ষাক্ষেত্র। রণ-ক্ষেত্রেই গেরিলা যোদ্ধারা যুদ্ধের সমস্ত কৌশল শিখে নেয়। অন্য সব শিক্ষাই দেওয়া হয় গোপন স্থানে। [illegible] কাওয়াজের পর গেরিলারা প্রাতরাশ করে অন্য এক জায়গায়। [illegible] মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বিশ্রাম। বিকালবেলা আর এক জায়গায় গেরিলারা রাজনৈতিক শিক্ষার ক্লাশে যোগদান করে। [illegible] দেশের রাজনৈতিক অবস্থা, হায়দরাবাদের রাজনৈতিক

অবস্থা, নিজাম-বাহিনীর রণকৌশল, তেলেঙ্গানার গেরিলাযুদ্ধের অবস্থা, বিভিন্ন স্থানের নিজাম-বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা চলে। সেই সব আলোচনা থেকেই গেরিলারা রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করে। এছাড়া যারা অশিক্ষিত, তাদের লেখা-পড়াও শেখানো হয়। রাত্রে তারা দলপতি কর্তৃক নির্দিষ্ট স্থানে বিশ্রাম নেয়, ঘুমোয়। রাত্রের এই ঘুমোবার জায়গাটি দলপতি ছাড়া আর কেউই জানতে পারে না।

"এই কর্মসূচী অনুসারে কাজ চলে বেশ কঠোরভাবে। এ ব্যাপারে কোন রকমের গাফিলতিই সহ্য করা হয় না। কারণ, তা হলে সমস্ত কিছু নষ্ট হবে, সবাই পুলিস আর নিজামের সৈন্যদের হঠাৎ আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যাবে। দূরবীন নিয়ে যারা শত্রুর গতিবিধির উপর সকল সময় নজর রাখছে তাদের উপর গেরিলা বাহিনীর জীবন-মরণ নির্ভর করে। তাদের সঙ্গে নেতারা সব সময় যোগাযোগ রেখে চলেন।

"একদিন এই গেরিলা-বাহিনী এক রাস্তার ধারে স্নান করছিল। এমন সময় গুপ্তচরেরা দৌড়ে এসে খবর দিল, কয়েক মাইল দূরে এক গ্রামে ৩০ জন সশস্ত্র পুলিশ গ্রামের ফসল লুট করতে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে গেরিলা-দলটিকে আক্রমণের আদেশ দেওয়া হল। স্থির হল, একদল আক্রমণ করবে পিছন দিক থেকে, দুইদল দু'পাশ থেকে, আর একটি ছোট দল সামনে থেকে শত্রুবাহিনীকে রুখবে। যথাসময়ে সঙ্কেত করা হল, আক্রমণ আরম্ভ হল। সামনের দলটির গুলিবর্ষণে দু'জন পুলিস নিহত হল। তারা ভীষণ ভয় পেয়ে মৃতদেহ নিয়ে পালিয়ে গেল। পিছন দিক থেকে যারা আক্রমণ করেছিল তাদের নেতা শত্রুপক্ষের জিপে চড়ে ফিরে এলেন। গাড়ীতে ছিল কেবল কয়েকখানি লুট করা বাসন। কোন অস্ত্র পাওয়া গেল না বলে সবাই খুব দুঃখিত হল।

"'দলম' রোজই শত্রুর উপর আক্রমণ চালায়। আর এদের নিয়মিত কাজ হল স্থানীয় গেরিলাদের সাহায্যে শত্রুর যোগাযোগ-ব্যবস্থা এবং জিপে করে যাওয়া-আসার রাস্তা ধ্বংস করে ফেলা। নিজাম সরকার

আবার এই রাস্তাগুলি সামরিক পাহারায় তৈরী করে। একদিন এক গাড়ী ভর্তি সৈন্যদল যাবার সময় ধ্বংস-করা রাস্তায় ফাঁদ পেতে ১৪ জনকে সাবাড় করা হয়। তাদের কাছ থেকে ১৪টা রাইফেল আর অনেক কার্তুজ পাওয়া গিয়েছিল। এমনি করে দিনের পর দিন গেরিলা-বাহিনী তাদের নতুন গণতান্ত্রিক জীবন, জমি, গৃহ আর স্বাধীনতা রক্ষা করে চলেছে।

"ক্রমে ক্রমে এদের সংগঠন আর সংগ্রামের আয়োজন উন্নত হতে উন্নততর হয়েছে। এখন রেললাইন উপড়ে ফেলার কৌশলও তারা আয়ত্ত করেছে। তারা এখন রেলপথ উপড়ে ফেলে গোটা হায়দরাবাদ রাজ্যে নিজামী শাসন অচল করে দেবার চেষ্টা করছে, আর ভারতের জনসাধারণকে সংগ্রামের নতুন কায়দা শেখাচ্ছে। মাত্র দুইদিনেই গেরিলারা ২০ জায়গায় রেলপথ উপড়ে দিয়ে নিজামের সমস্ত রেল-পথের ছয়টি অংশকে অচল করে দিয়েছে। তার ফলে রেল চলাচল সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। গেরিলারা বেজোয়াদা লাইনে একটা পুলের বেশিরভাগ ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। এছাড়া তারা মাইলের পর মাইল টেলিগ্রাফ লাইনের তার কেটে দিয়েছে, বহু খুঁটি উপড়ে ফেলেছে।

"এই 'দলম' জনগণেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। এরা জনসাধারণের খাদ্যে ভাগ বসায় না। এরা জমিদারের গোলা বাজেয়াপ্ত করে আর নিজেদের অর্থে দলের খাদ্য ও অন্যান্য জিনিস কিনে নেয়। তবু গ্রামের মধ্যে দিয়ে এরা যখন যায় সে দৃশ্য মানুষের মনে গভীরভাবে নাড়া দেয়। গোটা গ্রামের যুবক, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, শিশু সবাই ভিড় করে আসে তাদের অভ্যর্থনা করতে। সবাই তাদের অনুরোধ করে কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে কাটাবার জন্য। কিন্তু বসে সময় কাটানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই গ্রামবাসীরা চলমান 'দলমে'র পাশে পাশে গ্লাসে গ্লাসে শরবত ভর্তি করে খাওয়াতে থাকে আর নিজেদের কৃতার্থ বোধ করে। এইভাবে তারা 'দলমে'র প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানায়। কারণ, তারা জানে, নিজামের দীর্ঘকালব্যাপী উৎপীড়ন

রআ তাদের নতুন জীবনের মধ্যে এরাই হল প্রাচীর-স্বরূপ।

'দলমে'র জয়গান: "প্রচারের কাজে একবার 'দলমে'র একটি শাখা কয়েকটি গ্রামে ঘুরেছিল। গ্রামগুলিতে এর জন্য উৎসব লেগে গেল। সমস্ত লোক তাদের সেকেলে বাদ্যভাণ্ড নিয়ে জড় হল, তারা সবাই নতুন জীবনের গান গাইতে শুরু করে দিল, আর তাদের সৈনিক ছেলেদের সঙ্গে দীর্ঘ শোভাযাত্রা করে ঘুরে বেড়াতে লাগল। শেষে একটা সভা হল। সে সভায় 'দলমে'র একজন জোরালো ভাষায় এক বক্তৃতা দিলেন। বক্তা গ্রামবাসীদের কাছে লড়াইয়ের খবর দিলেন, আর জানালেন যে, বিশাল অন্ধ্ররাজ্য না গড়া পর্যন্ত তারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। তারপর 'দলমে' যোগ-দানের জন্য আহ্বান জানানো হল। গ্রামের যুবকরা এই 'দলমে' যোগ দেওয়া সম্মানজনক মনে করে, কারণ তারা জানে যে গ্রামের সেরা ছেলেরাই কেবল 'দলমে' যোগ দিতে পারে।

"নিজেদের সন্তানদের নিয়ে গড়া 'দলমে'র প্রতি জনগণের ভালবাসা যে কতখানি তা না দেখলে অনুমান করা যায় না। শুধু প্রাণ হাতে করে নয়, অনেক সময় প্রাণ দিয়ে তারা 'দলম'কে আশ্রয় দিয়েছে। আমি যে দলের সঙ্গে ছিলাম তারা এক গ্রামে এসে খাওয়া-দাওয়া করেছিল। কয়েকদিন পর সে গ্রামে নিজামের সৈন্যরা এসে দু'টি কৃষক-কর্মীকে গুলি করে মেরেছিল। তারা জানতে পেরেছিল যে ঐ দুটি কৃষককর্মী 'দলম'কে আশ্রয়-দানের ব্যাপারে খুব উৎসাহ দেখিয়েছে। 'দলম' আবার সে গ্রামে এসেছিল। সেবারেও গ্রামবাসীরা আবার তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করল: 'নিজামের দালালরা ধ্বংস হোক।' 'হত্যার প্রতিশোধ চাই।' 'সংঘম জিন্দাবাদ, বিশাল অন্ধ্র জিন্দাবাদ।'

"মৃত্যু এখানে কারোর মনেই ত্রাসের সঞ্চার করে না। কারণ, মরণকে তারা এত বেশী দেখেছে যে সকলেই তার জন্য প্রস্তুত। 'দলমে' নেওয়া হোক বা না হোক, গ্রামের প্রত্যেকটি যুবকই মনে-প্রাণে গেরিলা।

"নিজামের চার-পাঁচশো সৈন্য একসঙ্গে আসে, আর চার-পাঁচখানা গ্রাম ঘিরে ফেলে গেরিলাদের ধরবার চেষ্টা করে। 'দলমে'র গেরিলারা অবশ্য এই বেড়াজালের ফাঁক দিয়ে সরে পড়ে। কারণ, নিজামের সৈন্যদের ধারণা, এসব অঞ্চলের সমস্ত যুবকই কমিউনিস্ট, গেরিলা-যোদ্ধা। নিজামের সৈন্যরা গ্রামে ঢুকেই গ্রামের সমস্ত লোককে এক জায়গায় জড় করে, আর গেরিলা মনে করে কয়েক-জনকে বেছে নিয়ে গুলি করে মারে। বাকি সবাইকে তারা খুব ধমকায়, মেরে ফেলবার ভয় দেখায়। কিন্তু গ্রামের কেহই আজ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করেনি, কাউকে ধরিয়ে দেয়নি। কারণ সব বিশ্বাসঘাতক আগেই পালিয়ে গেছে।

কৃষকদের প্রতিশোধ: "শান্ত কৃষকদের মন থেকে ক্ষমার বাষ্প উবে গেছে। তারা আজ রক্তের বদলে রক্ত চায়। আমি যে দলের সঙ্গে ছিলাম তারা খবর পেল যে, একদল পুলিস আর রাজাকার দিনের বেলায় কয়েকটি গ্রামের উপর ভীষণ অত্যাচার করার পর রাত্রির জন্য এক দেশমুখের সুরক্ষিত গৃহে আশ্রয় নিয়েছে। শিকারের লোভে গেরিলারা মেতে উঠল, ভোর না হতেই তারা দেশমুখের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিল। এসব ক্ষেত্রে তারা আগুন লাগানোই সবচেয়ে ভাল উপায় বলে মনে করে। কারণ, গুলি ছুঁড়ে যুদ্ধ হলে তাদেরও ক্ষতি হতে পারে। আগুন লাগাবার পর শত্রুরা হন্তদন্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল, তারা এসে পড়ল গেরিলাদের বন্দুকের সামনে। তারা অস্ত্রত্যাগ করে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। গেরিলারা তাদের বন্দুকগুলো কুড়িয়ে নিয়ে তাদের বন্দী করল। এখন সমস্যা দেখা দিল, এই বন্দীগুলোকে নিয়ে কি করা যায়। গ্রামের কৃষকদের কাছে সবচেয়ে সহজ পথ হল এদের গুলি করে মারা। কারণ, গেরিলারা এসে না পড়লে এরা কৃষকদের খুন করত, স্ত্রীলোকদের সতীত্ব নাশ করত। তাই মৃত্যুই এদের উপযুক্ত শাস্তি। সুতরাং কুড়িজন পুলিস আর রাজা-কারকে গুলি করে মারা হল। পরে অবশ্য গুলি করে মারার নিয়ম

পাল্টাতে হয়। কারণ, এতে অনেক গুলি খরচ হয়। এর পর থেকে নিজামের সৈন্য, পুলিস আর রাজাকার বন্দীদের কেটে ফেলা হত। এতে অনেক গুলিগোলা বাঁচত। তেলেঙ্গানার শ্রেণী-সংগ্রাম এমনই হিংস্র, এমনই নির্মম যে, এখানে কোন পক্ষেই ক্ষমা নেই, ক্ষমা ভিক্ষাও নেই।

"তেলেঙ্গানার সংগ্রাম দমন করা যাবে না—নিজের চোখে সবকিছু দেখে এ বিশ্বাস আমার হয়েছে। এ সংগ্রাম কেবল কয়েকজন কমিউনিস্টের উস্কানির ফল নয়। অবশ্য এ অঞ্চলে কমিউনিস্টদের প্রভাব প্রচণ্ড, আর তরুণ কৃষকরা কমিউনিস্ট পার্টি আর 'দলমে' যোগদান পরম সম্মানের কাজ বলে মনে করে। এ সংগ্রাম হল তেলেঙ্গানার সমগ্র জনসাধারণের সংগ্রাম। তেলেঙ্গানার কৃষক লড়ছে এশিয়ার নিকৃষ্টতম সামন্ততান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে। তেলেঙ্গানার কৃষক লড়ে জমি পেয়েছে। এরা এদের নতুন পাওয়া জমি, স্বাধীনতা আর নিজেদের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা রক্ষার জন্য লড়বে, প্রাণ দেবে। ভারতে এরা নবযুগের সূচনা করেছে, নতুন সংগ্রামের উদ্বোধন করছে। তেলেঙ্গানার এ নতুন শক্তি অমর, কারণ এর শিকড় জনসাধারণের মধ্যে।"

॥ মারাথওয়াড়ার কৃষক-সংগ্রাম ॥

তেলেঙ্গানার-বিপ্লবী সংগ্রামের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল হায়দরাবাদের সর্বত্র। হায়দরাবাদ রাজ্যে বহু জাতির বাস। তেলেঙ্গানার তেলেঙ্গা বা অন্ধ্র চাষীদের সংগ্রামে উৎসাহিত হয়ে হায়দরাবাদের অন্যান্য জাতির কৃষকরাও সংগ্রাম আরম্ভ করল। হায়দরাবাদ রাজ্যের পশ্চিম অংশের মারাঠী ও কানাড়া ভাষাভাষী অঞ্চলে মারাথওয়াড়ার কৃষকরাও নিজামের শোষণ-শাসন থেকে মুক্তিলাভের জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে একে একে করিমনগর, বিদ, আওরঙ্গাবাদ, গুলবর্গ প্রভৃতি ২৫টি গ্রামের শত শত চাষী নিজ

নিজ গ্রামের পুলিস-চৌকি পুড়িয়ে দিয়ে সংগ্রাম আরম্ভ করল। এর পর থেকে সশস্ত্র পুলিস আর রাজাকারদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলতে লাগল। এসব সংঘর্ষে অনেক পুলিস আর রাজাকার নিহত হল। ৩০শে জুন নিজামের সশস্ত্র পুলিস আর রাজাকারদের এক বিরাট বাহিনী ইসলামপুর গ্রাম আক্রমণ করল। কৃষকেরা বড় গুলতি, তীর-ধনুক আর বর্শা নিয়ে রুখে দাঁড়াল। যুদ্ধ শেষ হলে দেখা গেল, ৫ জন কৃষক বীর শহীদ হয়েছেন, আর ১২ জন হয়েছেন আহত। অপর পক্ষে নিহত হয়েছে ৬ জন সৈন্য আর ১১ জন রাজাকার। তাদের বন্দুকগুলিও হস্তগত করল কৃষকেরা।

এর পর পুলিস আর রাজাকার গুণ্ডারা হঠাৎ কোন গ্রাম আক্রমণ করে ঘরে ঘরে আগুন লাগিয়ে পালিয়ে যেত, আর সম্ভব হলে লুটপাট করত। এইভাবে তারা ৪টি গ্রাম সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করে পালিয়ে যায়, আর পথে একা পেয়ে ১৮ জন কৃষক এবং এক বৃদ্ধকে গুলি করে মারে। কৃষকেরা এর পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করল, তেলেঙ্গানার মত গুপ্তচর-দল আর ছোট ছোট গেরিলাদল তৈরি করল। গ্রামে গ্রামে গ্রামরক্ষী বাহিনী গড়ে তোলা হল। কৃষক গেরিলারা পথেঘাটে লুকিয়ে থেকে সৈন্য, পুলিস আর রাজাকারদের দলগুলোর উপর হঠাৎ আক্রমণ করে তাদের ধ্বংস করে ফেলতে লাগল।

একদল সশস্ত্র রাজাকার একটি গ্রাম লুঠ করতে যাচ্ছিল। পথে গেরিলারা তাদের আক্রমণ করল, তারা প্রাণের ভয়ে যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল। গেরিলাদের বন্দুকের গুলিতে প্রাণ দিল ৭ জন রাজাকার। তাদের বন্দুকগুলি গেরিলাদের হস্তগত হল। একদিন গেরিলারা সংবাদ পেল, কোলি গ্রামের উপর প্রায় ১০০ জন পুলিস আক্রমণ করেছে, গ্রামরক্ষী দল তাদের রুখছে। গেরিলারা দৌড়ে গেল গ্রামরক্ষীদের সাহায্যে। তারা পেছন থেকে আক্রমণ করল পুলিসদের। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর পুলিসগুলো পালিয়ে গেল এদিক ওদিক, যুদ্ধক্ষেত্রে পড়ে রইল তাদের ৪২টা মৃতদেহ আর আহত ১২ জন পুলিস। তাদের ৫৪টি বন্দুক গেরিলাদের হস্তগত হল।

এরপর এই অঞ্চলের পুলিস আর রাজাকারদের মনোবল ভেঙে গেল। তারা ভয়ে গ্রামের উপর আক্রমণ বন্ধ করে দিল। এ সংবাদ শুনে নিজামের প্রধানমন্ত্রী লায়েক আলি স্থির করলেন তিনি স্বয়ং আসবেন পুলিস আর রাজাকারদের উৎসাহ দিতে। কিন্তু তার যাত্রা শুরু করবার পূর্বেই গেরিলারা তাঁর পথের একটা রেলপুল উড়িয়ে দিল। লায়েক আলি ভয়ে তাঁর আসা বন্ধ করে দিলেন। একদিন পুলিস ইসলামপুর গ্রাম আক্রমণ করল। গেরিলারা ছিল পাশেই এক গ্রামে লুকিয়ে। তারা দৌড়ে এসে দাঁড়াল পুলিসের মুখোমুখী। সে যুদ্ধে ১৬ জন পুলিসকে প্রাণ দিতে হয়েছিল, আর গেরিলাদের নিহত হয়েছিল ৬ জন। এই যুদ্ধেই এই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ কৃষককর্মী জয়ন্ত রাও নিহত হন।

কৃষক-সংগ্রামের পাশে শ্রমিকশ্রেণী

তেলেঙ্গানা সংগ্রামে প্রথম থেকেই হায়দরাবাদের শহরাঞ্চলের কলকারখানার শ্রমিকশ্রেণী কৃষকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামে নেমেছে, সংগ্রামী কৃষকদের উৎসাহিত করেছে, তাদের নানাভাবে সাহায্য করেছে—নেতৃত্ব দান করেছে। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসেই বিভিন্ন শহরের শ্রমিকগণ তেলেঙ্গানার সাহায্যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। তেলেঙ্গানার সংগ্রাম আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন শিল্প-কেন্দ্রের শ্রমিকেরা সভা ও শোভাযাত্রা করে কৃষকদের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানায়। সংগ্রামী কৃষকদের মধ্যে প্রচার ও তাদের উৎসাহ দানের জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে শ্রমিকদের প্রচারক দল (স্কোয়াড) গ্রামাঞ্চলে পাঠানো হয়। এসব ক্রিয়াকলাপ শ্রমিক-বিদ্রোহের পূর্বাভাস বলে মনে ক'রে নিজাম সরকার শ্রমিকদের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে। পুলিস বিভিন্ন স্থানের শ্রমিক-নেতাদের গ্রেপ্তার করে। শিল্পাঞ্চলে সৈন্যবাহিনী ঘাঁটি স্থাপন ক'রে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার আরম্ভ করে। এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠল হায়দরাবাদের বীর শ্রমিকশ্রেণী।

১৯৪৬ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে নিজামের সৈন্যবাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে ওয়ারাঙ্গাল, হায়দরাবাদ, নানদেদ, ঔরঙ্গাবাদ ও গুলবর্গের ১৫ হাজার সুতাকল শ্রমিক ধর্মঘট করে। তাদের ধর্মঘট চলেছিল দুই মাস ধরে। কোট্টাগুদামের খনি শ্রমিকরা তাদের প্রিয় নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আর কৃষক-সংগ্রামের সমর্থনে পাঁচবার ধর্মঘট করেছিল। পুলিস তাদের প্রিয় নেতা শেষগিরি রাওকে ১৯৪৮ সালে গ্রেপ্তার ক'রে গুলি ক'রে হত্যা করলে খনি-শ্রমিকেরা ধর্মঘট ও বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তারা পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে বহু পুলিসকে হত্যা ক'রে শেষগিরি রাওয়ের হত্যার প্রতিশোধ নেয়।

তেলেঙ্গানা সংগ্রামের প্রভাবেই হায়দরাবাদের হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায়ের শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিজামশাহীর বিরুদ্ধে আর তেলেঙ্গানার কৃষক-সংগ্রামের সমর্থনে দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম চালিয়েছিল। হিন্দু-মুসমলান শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য নিজাম সরকারের শত চেষ্টা অগ্রাহ্য করে মুসলমান শ্রমিকরা প্রত্যেকটি সংগ্রামে সমস্ত শক্তি নিয়ে যোগদান করেছিল। হায়দরাবাদ শহরের কমিউনিস্টরা প্রথমে ছিলেন পূরণচাঁদ যোশীর অনুচর। তারপর তাঁরা রণদিভের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নামে তেলেঙ্গানার কৃষকদের সশস্ত্র সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু হায়দরাবাদ শহরের রেল-শ্রমিক আর সুতাকল-শ্রমিকদের নির্মম সমালোচনা এবং প্রচণ্ড চাপে শহর-কমিটি তাদের মত বদলাতে বাধ্য হয়।

১৯৫০ সালে তেলেঙ্গানার কৃষক বন্দীরা হায়দরাবাদের হাইকোর্ট কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলে সমস্ত হায়দরাবাদে শ্রমিক-বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। সকল কল-কারখানার প্রায় ৮০ হাজার শ্রমিক দীর্ঘকাল যাবৎ ধর্মঘট ক'রে হায়দরাবাদের কল-কারখানা, যানবাহন সবকিছু অচল করে দেয়। নিজাম সরকার শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রাণদণ্ড মকুব করতে বাধ্য হয়। বহু শ্রমিক তেলেঙ্গানা বিপ্লবে

স্বেচ্ছাসেবক রূপে যোগদান করেছিল, অনেকে যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছিল। ভারতের ইতিহাসে এর কোন তুলনা নেই। এইভাবে বিপ্লবী সংগ্রামের নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে হায়দরাবাদের শ্রমিকশ্রেণী।

তেলেঙ্গানা বিপ্লবে শক্তি-সমাবেশ

ক্ষেত মজুর ও দরিদ্র কৃষক : ক্ষেত-মজুর আর দরিদ্র কৃষকরাই ছিল তেলেঙ্গানা বিপ্লবের মূল ও প্রধান শক্তি। তাদের দৃঢ়তা, নিষ্ঠা, উদ্যোগ আর আত্মত্যাগ ছিল সবচেয়ে বেশী। সংগ্রাম আরম্ভের প্রথম থেকেই এরা সংগ্রামের সম্মুখ সারিতে স্থান গ্রহণ করেছিল এবং শেষ পর্যন্ত সর্বস্ব পণ করে সংগ্রাম চালিয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য আর গেরিলাবাহিনীর সৈন্যদেরও বেশীর ভাগ এসেছিল ক্ষেত-মজুর আর গরীব কৃষকদের মধ্য থেকে। এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে যে, কমিউনিস্ট কর্মীরা গ্রামে পৌঁছাবার আগেই ক্ষেত-মজুর আর গরীব কৃষকদের জোয়ান ছেলেরা নিজেদের উদ্যোগে গেরিলাদল তৈরী করেছে, গুলতি, তীর-ধনুক, লাঠি, বল্লম প্রভৃতি নিয়ে রাজাকারদের উপর হঠাৎ আক্রমণ করে শেষ করে দিয়েছে, তাদের বন্দুকগুলি কেড়ে নিয়েছে। গ্রামরক্ষী বাহিনীর মধ্যেও এরাই ছিল সবচেয়ে সক্রিয়।

মাঝারি কৃষক : যারা নিজেদের জমি সাধারণত নিজেরাই চাষ করে তারাই মাঝারি-কৃষক। এরা জমিদার ও মহাজনের শোষণে-উৎপীড়নে সর্বস্বান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত কৃষি-শ্রমিকে পরিণত হয়েছে। তেলেঙ্গানা বিপ্লবে এরাও এগিয়ে এসে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগদান করেছিল। এদের যুবকরা যথেষ্ট সংখ্যায় গেরিলা-বাহিনীতে আর গ্রামরক্ষী বাহিনীতে যোগদান করে শয়ে শয়ে প্রাণ বলি দিয়েছিল এবং নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে যে, এই মাঝারি-কৃষকেরা গেরিলাদের আশ্রয় দিয়ে, খাদ্য সরবরাহ করে আর শত্রু-সৈন্যের গতিবিধির সংবাদ দিয়ে বহু সংখ্যায় শত্রুর হাতে প্রাণ দিয়েছে।

ধনী-কৃষক ঃ সংগ্রামের প্রথম ভাগে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালে ধনী-কৃষকেরাও সংগ্রামে যোগদান করেছিল। তারপর সংগ্রাম যতই সশস্ত্র আর বিপ্লবের আকার ধারণ করে, জমিদার-জায়গীরদারদের দখল করা জমি গরীব-কৃষক আর ক্ষেত-মজুরদের মধ্যে বিলি করা শুরু হয়, ততই ধনী কৃষকেরা সংগ্রাম থেকে দূরে সরে যায় এবং নিরপেক্ষ হয়ে থাকে। অবশ্য তারা গেরিলা বা সংগ্রামী চাষীদের বিরুদ্ধে কোন শত্রুতা বা পুলিসের সঙ্গে সহযোগিতা করেনি। কারণ, নিজাম আর জমিদাররা ছিল তাদেরও শত্রু।

ছাত্র-সম্প্রদায় ঃ তেলেঙ্গানা বিপ্লবে হায়দরাবাদের ছাত্রশক্তি এক অতুলনীয় ভূমিকা পালন করেছে, ভারতের সমগ্র ছাত্র-সম্প্রদায়ের জন্য চির-উজ্জল আদর্শ স্থাপন করেছে। সাহসে, বীরত্বে, বুদ্ধিতে, উদ্যোগে, কর্মে ছাত্রদের স্থান কারোর পিছনে নয়। ১৯৪৮ সালে তেলেঙ্গানার সংগ্রাম যখন চরমে ওঠে, যখন নিজামের সমস্ত সৈন্য আর পুলিস-বাহিনী সংগ্রামী কৃষকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেলেঙ্গানার উপর দিয়ে যখন রক্ত-বন্যা বয়ে যেতে থাকে, তখন হায়দরাবাদ রাজ্যের সমগ্র ছাত্রশক্তি সংগ্রামের সম্মুখ সারিতে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাদের সংগ্রাম-ধ্বনিতে সমগ্র হায়দরাবাদ কেঁপে উঠেছিল।

১৯৪৮ সালে হায়দরাবাদের সমস্ত ছাত্র "কলেজ ছাড়" ধ্বনি নিয়ে কলেজ ছেড়ে সংগ্রাম আরম্ভ করল। তারা দলে দলে অন্ধ্র-মহাসভায় আর কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিল। নিজেরাই দল বেঁধে গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল, নতুন নতুন গ্রামে গিয়ে কৃষক জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলতে লাগল। তারা উদ্যোগ নিয়ে বহু গ্রামে গেরিলাদল ও গ্রামরক্ষীদল গড়ে তুলল, নিজামের সৈন্যবাহিনী আর রাজাকার গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরম্ভ করল। তাদের সে সংগ্রাম ভারতের বিপ্লবী সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় যোজনা করেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সৈন্যবাহিনী তেলেঙ্গানায় প্রবেশ করার পর ছাত্রদের ক্রিয়াকলাপ নতুন নতুন দিকে প্রসারিত

হয়, তারা আত্মত্যাগ, বীরত্ব আর সাহসের নতুন নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে।

আলওয়ালা নরসিংহ রেড্ডী নামে একজন ছাত্রনেতা বহু গেরিলা-যুদ্ধে অংশ গ্রহণের পর ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে এক গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সংবাদ পেয়ে নেহেরু-প্যাটেলের সৈন্যবাহিনী গ্রাম ঘিরে ফেলল। নরসিংহ তাদের হাতে ধরা পড়তে প্রস্তুত নন। তিনি তাঁর বন্দুক দিয়ে মাথায় গুলি করে মৃত্যুবরণ করলেন। ছাত্র-নেতা সীতারামায়া ছিলেন একটি গেরিলা স্কোয়াডের নেতা। একদিন তাঁর স্কোয়াড সৈন্যদের বেড়াজালে পড়ে গেল। সীতারামায়া তাঁর দলকে পালাবার হুকুম দিলেন, আর নিজে তাঁর বন্দুক নিয়ে শত্রুদের আটকাবার ভার নিলেন। প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ করে তিনি অনেকক্ষণ শত্রুদের আটকে রাখলেন। ইতিমধ্যে তাঁর বন্দুকের গুলি ফুরিয়ে গিয়েছিল, আর নিজে শত্রুদের গুলিতে ভীষণ আহত হয়েছিলেন। দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে তিনি শুয়ে পড়লেন, আর হাতে নিলেন তাঁর শেষ সম্বল হাতবোমাটি। এদিকে সুযোগ বুঝে শত্রুরা এগিয়ে এল। সীতারামায়া তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে হাতবোমাটি ছুঁড়ে দিলেন শত্রু-সৈন্যদের দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়লেন তিনি। তাঁর হাতবোমার বিস্ফোরণে ৫ জন শত্রুসৈন্য নিহত হল। মোট ১১ জন শত্রুসৈন্য মেরে সীতারামায়া জীবন দিলেন। তাঁর স্কোয়াডের সবাই পালাতে পেরেছিল নিরাপদে। আর একজন ছাত্রনেতা ভেঙ্কট রেড্ডী। নালগোণ্ডা জেলার কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি করছিলেন তিনি তাঁর স্কোয়াড নিয়ে। এমন সময় শত্রুসৈন্যরা এসে তাঁদের ঘিরে ফেলল। বন্দুক নিয়ে তিনি শত্রুসৈন্যদের বাধা দিতে লাগলেন, আর তাঁর স্কোয়াডকে পালাবার হুকুম দিলেন। তাঁর গুলিতে ৬ জন শত্রুসৈন্য নিহত হল। তারপর তিনি ভীষণ আহত অবস্থায় ধরা পড়লেন। স্থির হল, তাঁকে গুলি করে মারা হবে। শত্রুরা জানতে চাইল, মরার আগে তাঁর শেষ ইচ্ছা কি। তিনি জানালেন, গেরিলা পোশাক পরে তিনি মরবেন—এই তাঁর শেষ

ইচ্ছা। সে ইচ্ছা তাঁর পূর্ণ হয়েছিল। আজও হায়দরাবাদের জনসাধারণের প্রিয় সন্তান ভেঙ্কট রেড্ডীর কাহিনী স্মরণ করে তারা পুত্রশোকে অধীর হয়ে পড়ে। আর একটি ছাত্র রামা রেড্ডী। কলেজ ছেড়ে গেরিলাযুদ্ধে যোগদান করেছিলেন তিনি। সৈন্যবাহিনীর চলাচলে বাধা দেবার জন্য তিনি তাঁর স্কোয়াড নিয়ে দুইটি রেলপুল আর চারটি রাস্তা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারপর সৈন্যদের ঘেরাও থেকে তাঁর স্কোয়াডের পালাবার সুযোগ দেবার জন্য শত্রুসৈন্যদের একাকী আটকে রেখেছিলেন দেড় ঘণ্টা। তারপর শত্রুসৈন্যদের গুলিতেই প্রাণ দিয়েছিলেন তিনি। এ ধরনের অসংখ্য কাহিনী আছে তেলেঙ্গানা বিপ্লবের ইতিহাসে।

তেলেঙ্গানা বিপ্লবে নারীদের অবদান

তেলেঙ্গানা বিপ্লবে নারীদের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তারা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে জমির জন্য আন্দোলনে, কৃষি-শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির সংগ্রামে, জমিদারদের শস্য-ভাণ্ডার থেকে শস্য কেড়ে নেওয়ার সংগ্রামে, তাদের কেড়ে নেওয়া জমি ও ঘরবাড়ি পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে, এবং এইসব সংগ্রামে যোগদানের জন্য শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রদের উৎসাহিত করার জন্য আন্দোলনে। তারা ছিল হায়দরাবাদের নিজাম ও ভারত সরকারের পুলিস ও সৈন্যবাহিনীর এবং রাজাকার নামক নিজামের পোষা গুণ্ডাবাহিনীর পাশবিক উৎপীড়নের শিকার। নিজামশাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর তাদের উপর অবাধে চলেছে ধর্ষণ আর নানাধরণের পাশবিক অত্যাচার। তারা নিজেদের চোখে দেখেছে স্বামী, ভাই, সন্তানদের পশুতুল্য রাজাকার গুণ্ডাবাহিনী ও নেহেরু সরকারের পুলিস আর সৈন্যদের হাতে নিহত হতে, অবর্ণনীয় দৈহিক অত্যাচার চলতে। তাই এই নিরীহ নারীদের মধ্যে জ্বলে উঠেছে তীব্র প্রতিরোধ ও প্রতিহিংসার আগুন। তাদের সংগ্রামের উদ্দীপনায়, প্রতিহিংসা গ্রহণের প্রচেষ্টায় ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক সংগ্রামের উৎসাহে মেতে উঠেছিল।

নারী-শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির সংগ্রাম ঃ কৃষি-শ্রমিকদের মধ্যে নারীদের সংখ্যাই বেশী। তাই কৃষি-শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির সংগ্রামে নারীরাই সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় অংশ গ্রহণ করেছে। কৃষি-শ্রমিকদের ধর্মঘটে, জমিদারদের শস্য কেড়ে নেওয়ার সংগ্রামে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় অংশ গ্রহণ করেছে তারাই। তাদের বেশী সংখ্যায় যোগদানের জন্যই কৃষি-শ্রমিকরা শেষপর্যন্ত সকল স্থানে তাদের মজুরি বৃদ্ধির আন্দোলনে জয়লাভ করেছে।

পুলিশ উৎপীড়নের বিরুদ্ধে নারীদের সংগ্রাম ঃ নারীদের সংগ্রামের জন্যই বহুস্থানে পুলিসের উৎপীড়ন বন্ধ হয়েছে। বহুস্থানে জমিদারদের গুণ্ডাবাহিনী নারীদের হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে গ্রাম থেকে পালিয়ে গেছে।

এক গ্রামে ভারতীয় সেনা-বাহিনী আর কংগ্রেসের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কংগ্রেস শাসকদের নির্দেশে সৈন্য ও পুলিসের দল কৃষকদের ভয় দেখাবার জন্য বহু সংখ্যক কৃষককে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে কৃষক রমণীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে পুলিস ও সৈন্যদের উপর। তারা পুলিসের গাড়ীগুলি ঘিরে থাকল, ঘোষণা করল, যতক্ষণ পুরুষদের ছেড়ে দেওয়া না হবে ততক্ষণ তারা গাড়ী চলতে দেবে না। তাদের পিঠে পড়তে লাগল লাঠি আর রাইফেলের বাটের আঘাত। তাদের সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেলেও তারা গাড়ীগুলি ঘিরে বসে রইল। পুলিস ও সৈন্যরা শেষ পর্যন্ত সব পুরুষকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

গোদাবরী বন এলাকায় কৃষকরা গেরিলা যোদ্ধাদের সাহায্য করে মনে ক'রে সৈন্যরা কৃষকদের গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল। এই সংবাদ শোনামাত্র ১০ খানা গ্রামের নারীরা দৌড়ে এসে সৈন্য ও পুলিসদের ঘিরে ফেলল। সৈন্য ও পুলিসরা তাদের ভয় দেখাবার জন্য গুলি চালাল। নারীরা বন-জঙ্গলের আড়ালে লুকিয়ে থেকে সৈন্য ও পুলিসদের সঙ্গে ইট-পাথরের টুকরো দিয়ে লড়াই করল অনেকক্ষণ। শেষ পর্যন্ত সৈন্য আর পুলিসরা পালিয়ে গিয়ে প্রাণ

বাঁচাল। ইঁট পাথরের ঘায়ে বহু সৈন্য ও পুলিস ধরাশায়ী হয়েছিল সেই সংঘর্ষে।

আর এক গ্রামের কথা। নিজামের সৈন্যরা গ্রামে ঢুকে ভীষণ অত্যাচার শুরু করলে গ্রামের সমস্ত নারীপুরুষ একত্রে তীর, ধনুক, বল্লম আর ইঁট-পাথর নিয়ে ঝোপ-জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে সৈন্যদের বাধা দেয়। এই সংঘর্ষে একজন সুবেদার ও তিনজন সৈন্য নিহত হয়। গ্রামবাসীরা তাদের চারটি বন্দুক হস্তগত করে। এরপর যখনই বেশী সৈন্যরা গ্রামে ঢুকত তখনই গ্রামের সমস্ত নারীপুরুষ সব বালক-বালিকা ও শিশুসহ গভীর জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে থাকত।

নালগোণ্ডা অঞ্চলের গ্রামগুলির প্রায় সব পুরুষই 'দলম' বা গেরিলা বাহিনীর সভ্য ছিল। তাদের গ্রেপ্তার করার জন্য সৈন্য আর পুলিসরা বহু সংখ্যায় আকস্মিকভাবে গ্রামে ঢুকে পড়ত। গ্রামের পুরুষরা পাহারাদারদের সংকেত পেয়ে পালিয়ে যেত বন-জঙ্গলের মধ্যে। সৈন্য আর পুলিসের দল গ্রামের পুরুষদের না পেয়ে আক্রমণ করত নারীদের। তাদের উপর চলত পাশবিক অত্যাচার ও অন্য সব রকমের অত্যাচার, আর তারা ঘরের জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে যেত। সৈন্য আর পুলিসরা গ্রাম থেকে চলে গেলেই নারীরা দলবদ্ধভাবে দা ও বটি, ছোরাছুরি প্রভৃতি নিয়ে পিছন থেকে আক্রমণ করত সৈন্য আর পুলিসদের। নারীদের এই প্রকার আক্রমণে বহু সৈন্য ও পুলিস নিহত ও আহত হত আর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে পালিয়ে যেত।

নারীদের গেরিলাদল : তেলেঙ্গানার সংগ্রাম আরম্ভের প্রথম থেকেই পুরুষদের মত নারীরাও জমিদার ও নিজামসাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগদান করে, আর শেষ পর্যন্ত তারা সংগ্রাম চালিয়ে যায়। তাদের একাগ্রতা, আত্মত্যাগ, কষ্টসহিষ্ণুতা পুরুষদের চেয়ে কিছুমাত্র কম ছিল না। যখন যুবকদের নিয়ে গেরিলাদল তৈরী হল তখন নারীরাও দাবি জানাল তাদেরও গেরিলাদলে নিতে হবে, কেবল নারীদের নিয়ে গেরিলাদল তৈরী করতে হবে। অবশেষে

নারী গেরিলাবাহিনী তৈরী হল। এই নারী গেরিলাবাহিনী আমাদের সংগ্রামের ইতিহাসে সম্পূর্ণ নতুন, এক চিরস্মরণীয় ঘটনা। এই বাহিনীর প্রধানদের জীবন ও সংগ্রামের কাহিনী সংক্ষেপে দেওয়া হল :

নালগোণ্ডা জেলার স্বরজ্যম : স্বরজ্যম, বি. নরসীমা রেড্ডীর ছোট বোনটি। অতি অল্প বয়স থেকেই সে 'অন্ধ্র মহাসভা' ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী। সে এই অঞ্চলের 'কয়া' কৃষি শ্রমিকদের এবং অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তাদের নিয়ে এক বিরাট সংগ্রামী শক্তি গড়ে তোলে। এই সঙ্ঘবদ্ধ কৃষি-শ্রমিকরা নালগোণ্ডা জেলাকে এক বিশাল সংগ্রাম ক্ষেত্রে পরিণত করেছিল।

নালগোণ্ডার রামলাম্মা : নিজামশাহীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর ভারত সরকারের সৈন্যবাহিনী নিজামকে রক্ষা করার জন্যে জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে। রামলাম্মা তাঁর সংগ্রামী নারীবাহিনী নিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁর নেতৃত্বে নারীবাহিনী বহু দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপের দ্বারা নালগোণ্ডার এক বিরাট অঞ্চলের সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। একবার রামলাম্মা সৈন্য ও পুলিসের হাতে ধরা পড়ে যায়। তারা তাঁকে শহরে নিয়ে যাচ্ছিল। এই সংবাদ প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গ্রাম থেকে ছুটে আসে কয়েক শ' নারী। তারা সৈন্য ও পুলিসের সঙ্গে যুদ্ধ করে রামলাম্মাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়।

একটি 'কয়া' মেয়ে গেরিলার কাহিনী : নাম তার ভেঙ্কাটাম্মা। অনেক চেষ্টা ও দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপের পর সে নারী গেরিলাবাহিনীতে ঢুকতে পেরেছে। প্রথমেই সে বন্দুক ছুড়তে শিখল। তাঁর লক্ষ্য ছিল অব্যর্থ। সে কয়েকবার সৈন্য ও পুলিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে এবং অনেক সৈন্য ও পুলিসকে হত ও আহত করেছে। অবশেষে সে হল তার গেরিলাদের প্রধান নেত্রী।

'কয়া' নারী গেরিলা লাছাক্কার কাহিনী : লাছাক্কা এক নারী

গেরিলাবাহিনীর দুই নম্বর নেত্রী। একদিন তাঁর বাহিনী এক পুলিসের দলকে যুদ্ধে হারিয়ে গ্রামে ফিরে যাচ্ছিল। এমন সময় তাঁর বাহিনীর উপর আক্রমণ করল একদল ভারতীয় সৈন্য। লাছাক্কার হাতে একটা স্টেনগান। সে তাঁর স্টেনগান থেকে গুলি চালাল। তাঁর স্টেনগানের গুলির আঘাতে হত হল চারজন পুলিস। এই সুযোগে তাঁর বাহিনীর তিনজন গেরিলা পালাতে পারল। সে নিজেও পালিয়ে গেল কিছুদূরের একটা কাঁটা ঝোপের ভিতর দিয়ে। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর একটা কাঁটাওয়ালা গাছের ডালে তাঁর মাথার খোঁপাটি আটকে গেল। অনেক চেষ্টা করেও সে খোঁপাটি কাঁটার ডাল থেকে ছাড়াতে পারল না। ইতিমধ্যে শত্রু সৈন্যরা কাছে এসে পড়েছে। তাদের গুলির আঘাত লাগল তাঁর মাথায়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হল।

এই রকমের বহু কাহিনী আছে তেলেঙ্গানার মেয়েদের গেরিলা সংগ্রামের।

তেলেঙ্গানার জনগণতন্ত্র

তেলেঙ্গানার সংগ্রাম এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দখল করা অঞ্চলে কৃষক জনসাধারণের নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ১৯৪৮ সালের প্রথম ৬ মাসের মধ্যেই অত্যাচারী জমিদার, দেশমুখ, জোতদার প্রভৃতিদের হাত থেকে ৩০ লক্ষ বিঘা জমি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। কেড়ে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে জমি গরীব-চাষী, ক্ষেত-মজুর প্রভৃতিদের মধ্যে বিলি করা হয়। বিলি করার পর সে জমির স্বত্ব দেওয়া হয় কৃষকদেরই হাতে।

মোট তিন রকমের জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। প্রথমত, যে সমস্ত জমি দেশমুখ, জায়গীরদার, জোতদার প্রভৃতিদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল তা সমস্তই বাজেয়াপ্ত করা হয়। দ্বিতীয়ত, যে সব জমি কৃষকদের কাছ থেকে দেশমুখ, জমিদার, মহাজনরা কেড়ে নিয়েছিল সে জমি বাজেয়াপ্ত করে যাদের জমি

তাদের হাতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তৃতীয়ত, 'প্রেম্বোক' বা পতিত জমি দখল ক'রে নিয়ে কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়।

গরীব-চাষী আর জমিহীন ক্ষেত-মজুর গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ। এরাই ছিল সংগ্রামের সামনের সারিতে। তাদের মধ্যে কেবল জমিই বিলি করা হয়নি, তাদের মজুরির পরিমাণও দ্বিগুণ করে দেওয়া হয়। এর ফলে উৎসাহিত হয়ে নতুন নতুন এলাকার কৃষকরাও এসে বিপ্লবী সংগ্রামে যোগদান করেছে, যারা ছিল পিছনে তারা দলে দলে সামনে, সংগ্রামের প্রথম সারিতে এগিয়ে এসেছে।

এই বিপ্লবী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজাম, জায়গীরদার, দেশমুখ প্রভৃতির শোষণ-শাসনের অবসান ঘটিয়ে তেলেঙ্গানায় যে মুক্ত, স্বাধীন অঞ্চল গড়ে উঠেছিল তার পরিমাণ সামান্য নয়। সমগ্র হায়দরাবাদ রাজ্যের ২২ হাজার গ্রামের মধ্যে আড়াই হাজার গ্রাম নিয়ে গড়ে উঠেছিল জনগণের এই স্বাধীন রাজ্য—তেলেঙ্গানার জনগণতন্ত্র। এর লোকসংখ্যা ছিল ৫০ লক্ষ—সমগ্র হায়দরাবাদ রাজ্যের মোট লোকসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ। এই জনগণতান্ত্রিক সরকারের নিয়মিত গেরিলা যোদ্ধা-বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৩ হাজার, আর গ্রামে গ্রামে গ্রামরক্ষী বাহিনী গড়ে উঠেছিল মোট ১০ হাজার কৃষক নিয়ে।

এই স্বাধীন জনগণতন্ত্রের রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল গ্রামে গ্রামে জনসাধারণের নিজস্ব শাসন। প্রত্যেক গ্রামে নিজামের অনুচর আর নিজামশাহীর সঙ্গে সহযোগিতাকারীদের বাদ দিয়ে গ্রামের সমস্ত জনসাধারণ নিজেদের স্বাধীন মত অনুসারে গ্রাম সরকার অর্থাৎ 'গ্রাম-পঞ্চায়েত' গঠন করেছিল। এই পঞ্চায়েত-রাজ জনসাধারণের আদালত বসিয়ে বিশ্বাসঘাতকদের শাস্তি দিত, গ্রামরক্ষী-দল গঠন করে গ্রাম রক্ষার ব্যবস্থা করত, জমি দখল ও বিলি করত, চাষবাসের তত্ত্বাবধান করত। এরই সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েত-সরকার ক্ষেত-মজুর ও অন্যান্য শোষিত শ্রেণীর আর্থ-নীতিক অধিকার সুরক্ষিত করেছিল এবং জায়গীরদার, দেশমুখ প্রভৃতিদের সমস্ত অন্যায় অধিকারও লোপ করেছিল।

কৃষকদের কাছ থেকে দেশমুখ আর জায়গীরদাররা যে সব জমি কেড়ে নিয়েছিল তা গ্রামের পঞ্চায়েত দখল করে নেয়। সে জমির অর্ধেক দেওয়া হয়েছিল মূল মালিককে, পরে যে-চাষী তা চাষ করত তাকে দেওয়া হয়েছিল সিকিভাগ, আর আগে যে চাষ করত তাকে দেওয়া হয় বাকি সিকিভাগ। পতিত ও অন্যান্য জমি ক্ষেত-মজুরদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়েছিল। দেশমুখ আর বিশ্বাসঘাতক ধনী-কৃষকদের নিজেদের জমিও চাষীদের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল। কৃষকদের উপবাসী রেখে বড় বড় জমিদাররা যে বিপুল পরিমাণ শস্য জমিয়ে রেখেছিল তাও বাজেয়াপ্ত করে গরীব-চাষী আর ক্ষেত-মজুরদের মধ্যে বিলি করে দেওয়া হয়েছিল। কৃষকদের বাকী খাজনা, ঋণ এবং জমিদার-মহাজনদের সমস্ত পাওনা মকুব করা হয়েছিল। এসব পাওনা আদায় করার চেষ্টাও বে-আইনী বলে ঘোষণা করে দেওয়া হল। পঞ্চায়েতরাজ আরও ঘোষণা করেছিল যে, জমি যে চাষ করবে সে-ই হবে জমির মালিক। তাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করা চলবে না।

এভাবে ১৯৪৮ সালের মধ্যে ৩৬ লক্ষ বিঘা জমি দখল করে কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়েছিল। তেলেঙ্গানার মুক্ত অঞ্চলের সমস্ত ক্ষেত-মজুর জমি পেয়েছিল; তাছাড়া ক্ষেত-মজুরদের মজুরির হার বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হল। ক্ষেত-মজুর আর গরীব-চাষীদের ঘরের ব্যবস্থাও করেছিল তেলেঙ্গানার জনগণতান্ত্রিক সরকার। আগে ঘর তোলার জন্য জমি নিতে হত নিজাম আর দেশমুখদের মোটা টাকা সেলামি দিয়ে। তার জন্য ঘর ছিল না অনেকেরই। এখন গ্রাম পঞ্চায়েত ঘর তৈরী করার জন্য বিনামূল্যে জমি এবং জিনিসপত্রও সরবরাহ করল। তাই গরীব-চাষী বাপ-ঠাকুর্দার জীবনে যা পায়নি, তা এবার পেয়ে গেল তাদের নিজেদের সরকারের কাছ থেকে। নতুন জীবনের ভিত্তি গড়ে উঠল শতাব্দীকালের শাসন-জর্জরিত তেলেঙ্গানায়।

গ্রাম-সরকার বা গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা ছিল গ্রামের জন-

সাধারণের জীবনে এক মস্তবড় উৎসবের ব্যাপার। গ্রাম-সরকার প্রতিষ্ঠার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। নালগোণ্ডা জেলার ভক্তলপুরম গ্রামে স্বাধীন সরকারের প্রতিষ্ঠা হবে। সকাল বেলায় গ্রামের সমস্তা কৃষক মিলে স্বাধীনতার নতুন সংকল্প গ্রহণ করল। সেদিন সারা গ্রামকে লাল-পতাকা আর ফুল-পাতা দিয়ে সাজানো হল। একদল থাকল গ্রামের পাহারায়। তারপর গ্রামের ২১ বছর বয়সের সমস্ত স্ত্রী-পুরুষ মিলে এক সভা করে, এবং গোপনে ভোট দিয়ে নিজেদের গ্রাম-সরকারের নির্বাচন করল।

গ্রাম সরকার নির্বাচিত হয়েই প্রথম ঘোষণা করল—"আমরা নিজামের শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করছি এবং পূর্ণ-স্বাধীনতা ঘোষণা করছি।" এই ঘোষণা শুনে সমস্ত মানুষ আনন্দে চিৎকার করে উঠল—"লালঝাণ্ডা কি জয়।" তারপর জনসাধারণ নির্বাচন করল গণ-আদালতের বিচারকদের। এরপর গ্রামের যুবকদের নিয়ে গ্রামরক্ষী-বাহিনী গঠন করা হল। ঐ দিনই বিচারকগণ বন্দী প্যাটেল, দেশমুখ আর দালালদের দুষ্কার্যের বিচার করে তাদের সম্পত্তি কেড়ে নেবার আদেশ জারি করলেন। তারপর গ্রামের দেশমুখ, প্যাটেল প্রভৃতি শোষকদের বড় বড় বাড়ীগুলি দখল করে সেখানে সরকারের দপ্তর স্থাপন করা হল।

নেহেরু সরকারের আক্রমণ

তেলেঙ্গানা বিপ্লবকে ধ্বংস করতে ব্যর্থ হল নিজাম সরকার। একে ধ্বংস করা দূরের কথা, ১৯৪৮ সালের মধ্যে এই বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ল তেলেঙ্গানা ছাড়িয়ে মাদ্রাজের অন্ধ্র অঞ্চলেও। অন্ধ্রেও শুরু হল কৃষকের সশস্ত্র সংগ্রাম, গড়ে উঠল কয়েকটি মুক্ত অঞ্চল। তেলেঙ্গানা বিপ্লবের বজ্রনির্ঘোষে সারা ভারতের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোটা কেঁপে উঠল। নেহেরু-সরকারের অন্যতম অংশীদার সামন্ততান্ত্রিক প্রভুরা—রাজা-মহারাজ-জমিদারগোষ্ঠী ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়তে আরম্ভ করল। তাদের চাপে, তাদের শোষণ-ব্যবস্থা রক্ষা করতে, শেষপর্যন্ত

নেহেরু-সরকার তেলেঙ্গানার উপর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিল। ১৯৪৮ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর নেহেরু-প্যাটেল পরিচালিত ভারত সরকারের ২৬ হাজার সৈন্য হায়দরাবাদে প্রবেশ করল। এই বাহিনী পরিচালনার ভার দেওয়া হল ভারতীয় সেনাপতিদের মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর বলে কুখ্যাত জেনারেল জে. এন. চৌধুরীকে। তার সহকারী-রূপে এল নিষ্ঠুরতর চরিত্রের ক্যাপ্টেন নানজাপ্পা। তারা দুজনেই সারা ভারতবর্ষকে জানিয়ে দিল—মাত্র দু'মাসের মধ্যেই তারা তেলেঙ্গানা বিপ্লব ধ্বংস করে ফেলবে। কিন্তু তেলেঙ্গানার কৃষক তাদের সে গর্ব চূর্ণ করেছিল। এই দুই সেনাপতির সমস্ত নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা, পৈশাচিকতার উপযুক্ত জবাব দিয়ে তেলেঙ্গানা বিপ্লব পূর্ণোদ্যমে চলল ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত।

নেহেরু-প্যাটেল-পরিচালিত একচেটিয়া-বুর্জোয়া আর সামন্ত-প্রভুদের স্বার্থবাহী ভারত সরকারের পশুশক্তির প্রতীক ঐ দুই সেনাপতির নেতৃত্বে তেলেঙ্গানায় প্রায় ৫ হাজার বিপ্লবী কৃষক আর কমিউনিস্টকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল, প্রায় দেড়শত কৃষক রমণীকে ধর্ষণ করেছিল, ২৫ খানি গোটা গ্রাম আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছিল, ১০ হাজার ঘর পুড়িয়ে আর ভেঙে ধূলিসাৎ করেছিল, আর বিতাড়িত জায়গীরদার, দেশমুখ, প্যাটেলদের ফিরিয়ে এনেছিল। তবু তেলেঙ্গানা হিমালয়ের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, তার সংগ্রাম নতুন নতুন অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছিল। সৈন্য বাহিনীর অমানুষিক উৎপীড়ন তেলেঙ্গানার বিপ্লবী কৃষকদের মধ্যে দুর্বার, অজেয় শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছিল। নেহেরু-প্যাটেল-চৌধুরী-নানজাপ্পা-নিজামদের সাধ্য ছিল না সেই শক্তিকে চূর্ণ করবার।

নেহেরু-সরকারের সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে তেলেঙ্গানা বিপ্লব ধ্বংস হয়নি। তেলেঙ্গানা বিপ্লবের আগুন নিবে গিয়েছিল সৈন্য-বাহিনী অপেক্ষাও বড় শত্রু, বড় শয়তানদের শয়তানীতে, তাদের ষড়যন্ত্রে আর বিশ্বাসঘাতকায়। তারা পিছন থেকে ছুরি মেরে তেলেঙ্গানার পতন ঘটিয়েছিল। তারা হল সেকালের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

অন্ধ্র পার্টির চিঠি

তেলেঙ্গানা বিপ্লবের প্রভাব সবচেয়ে বেশী পড়েছিল তেলেঙ্গানার পরেই পার্শ্ববর্তী মাদ্রাজ রাজ্যের অন্ধ্র অঞ্চলের তেলেগু-ভাষাভাষী কৃষকদের উপর। তেলেঙ্গানার সংগ্রাম অন্ধ্রের কৃষকদের মধ্যেও জমিদার-বিরোধী সংগ্রামের প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিল। সেদিন অন্ধ্রের কমিউনিস্টরা তেলেঙ্গানার এই সংগ্রামকে ভারতের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী কৃষক-বিপ্লবের অর্থাৎ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রদূত বলে গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের প্রথম ভাগেই তেলেঙ্গানা আর অন্ধ্রের কমিউনিস্টদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয় এবং তেলেঙ্গানা আর অন্ধ্রের সংগ্রাম একযোগে চালাবার আয়োজন চলে। তারপর অন্ধ্রের পার্টি-কমিটি তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রের এই সশস্ত্র বিপ্লবী সংগ্রামের আদর্শগত ভিত্তি গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁদের এই আদর্শগত আলোচনাই 'অন্ধ্র পার্টির চিঠি' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

এই আলোচনা ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন ব্যাপার। এর পূর্বে ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের আলোচনা হলেও এ সম্বন্ধে এত বিস্তারিত আলোচনা আর কখনও হয়নি। তাছাড়া এই আদর্শগত আলোচনার আরম্ভ হয়েছিল তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লড়াইয়ের ময়দানে। আর এই আদর্শগত আলোচনার ভিত্তি ছিল সাম্রাজ্যবাদের অন্তিমকালে উপনিবেশ ও আধা-উপনিবেশের বিপ্লব সম্বন্ধে মাও সে-তুঙের চিন্তা-ধারা ও চীন-বিপ্লবের আদর্শ। তাই অন্ধ্রের এই পার্টি-চিঠির গুরুত্ব ছিল অসাধারণ।

১৯৪৮ সালের জুন মাসে এই চিঠি অন্ধ্রের পার্টির মধ্যে প্রচারিত হয়। এই চিঠিতে কমিউনিস্ট পার্টির অন্ধ্র-কমিটি ঘোষণা করেছিলেন, "মাও সে-তুঙের 'নয়া-গণতন্ত্র'ই ভবিষ্যৎ ভারতের পথ নির্দেশ করবে।" মাওয়ের আদর্শ অনুসরণ করেই তাঁরা বলেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র-বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তরে ভারতের সকল

বুর্জোয়ারাই নয়, কেবল বড়, একচেটিয়া-বুর্জোয়াগোষ্ঠী আর সামন্ত-তান্ত্রিক জমিদারগোষ্ঠীই ভারতের জনসাধারণের, কৃষকের প্রধান শত্রু। সুতরাং বিপ্লবের এই স্তরে কৃষক জনসাধারণের সকল অংশই শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়া-বুর্জোয়াগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগদান করবে, গেরিলাযুদ্ধ চালাবে। দীর্ঘস্থায়ী, সশস্ত্র গেরিলাযুদ্ধই হবে এই সংগ্রামের প্রধান রূপ। এই পার্টি-চিঠিতে লেখা হয়েছিল :

"এই জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে মাঝারী-কৃষক হবে বিপ্লবের সহযোগী। তারা সংগ্রামে পুরোপুরি অংশ গ্রহণ করবে। সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে ধনী-কৃষকদের কোন সম্পর্ক নেই। তাই তাদের নিরপেক্ষ করে রাখা সম্ভব। কিন্তু তেলেঙ্গানা, রয়ালসীমা প্রভৃতি যে সব অঞ্চলে সামন্ততন্ত্র অত্যন্ত শক্তিশালী, সে সব অঞ্চলে ধনী-কৃষকরা অস্থিরচিত্ত হলেও তাদের সামন্ততন্ত্র-বিরোধী সংগ্রামে টেনে আনা সম্ভব।"

ভারতের বর্তমান বিপ্লবের স্তর হল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর, আর রাশিয়ার বিপ্লব ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। এই পার্থক্য দেখিয়ে অন্ধ্রের পার্টি-চিঠির উপসংহারে ভারতবর্ষের বিপ্লব সম্বন্ধে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত করা হয় :

"বিভিন্ন দিক থেকে ভারতের বিপ্লব আর রাশিয়ার বিপ্লবের মধ্যে পার্থক্য অনেক। কেবল সাধারণ ধর্মঘট আর শহরের জনসাধারণের অভ্যুত্থানের মারফত (সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে) গ্রামাঞ্চলের মুক্তি আসবে না, কৃষক-বিপ্লবের আকারে গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে চলবে প্রচণ্ড প্রতিরোধ আর গৃহযুদ্ধ। সেই প্রতিরোধ আর গৃহযুদ্ধের মধ্যে দিয়েই শেষ পর্যন্ত শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করবে।"

এছাড়া অন্ধ্র-পার্টি তাঁদের এই চিঠিতে ভারতের অন্ধ্র, মারাঠি, কানাড়ী প্রভৃতি জাতিসমূহের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের প্রশ্নটিও তুলেছিলেন, আর এর সঙ্গে মাও সে-তুঙের সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র-বিরোধী কৃষক-বিপ্লবের আদর্শ ও তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলেন।

কমিউনিস্ট-নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতা

১৯৪৮ সালে তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং এর আদর্শের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করলেন কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালের সাধারণ সম্পাদক, "অতি-বিপ্লবী" বলে কুখ্যাত বি. টি. রণদিভে। প্রথমে ১৯৪৬-৪৭ সালের তেলেঙ্গানা সংগ্রামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন পার্টির তৎকালের সাধারণ সম্পাদক পূরণচন্দ্র যোশী। তিনি চেয়েছিলেন হায়দরাবাদ আর তেলেঙ্গানাকে নিজামের অধীনে কংগ্রেস শাসনের তাঁবেদার করে রাখতে। তার জন্য তিনি ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত গভীর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছিলেন। তাঁর চেষ্টার ফলেই তেলেঙ্গানার সংগ্রাম প্রথম দিকে বিপ্লবের স্তরে পৌঁছাতে পারেনি। ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে অজয় ঘোষের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তেলেঙ্গানা সংগ্রামের অবসান ঘোষণা করলেন। সুতরাং বলা যায়, ভারতের প্রথম জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, অর্থাৎ তেলেঙ্গানা বিপ্লব সম্বন্ধে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ইতিহাস কেবল বিশ্বাস-ঘাতকতারই ইতিহাস। নিজাম-নেহেরু-প্যাটেল-চৌধুরী-নানজাপ্পারা যা পারে নি, কমিউনিস্ট নেতারা তা অনায়াসে পেরেছিলেন।

তেলেঙ্গানার সংগ্রাম যখন ধাপে ধাপে পুরোপুরী বিপ্লবের রূপ নিচ্ছিল তখনই, ১৯৪৮ সালে রণদিভে আসরে নামলেন। তেলেঙ্গানার সংগ্রাম ভারতের কৃষি-বিপ্লবের প্রশ্নটিকে সামনে তুলে ধরেছিল। বিশেষত ইতিমধ্যেই 'অন্ধ্রের পার্টি-চিঠি' সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র-বিরোধী কৃষি-বিপ্লবের সংগ্রামের প্রশ্নটিকে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের মূল সমস্যারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। কাজেই রণদিভে 'অন্ধ্রের পার্টি-চিঠির' সমালোচনার ছলে আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের নাম করে তেলেঙ্গানা বিপ্লবের উপর আক্রমণ চালালেন 'কমিউনিস্ট' নামক মাসিক পত্রিকায় ৪টি প্রবন্ধের মারফত। তেলেঙ্গানার কৃষি-বিপ্লবের সংগ্রামের মূল ভিত্তি ছিল মাও সে-তুঙের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব, আর 'অন্ধ্র পার্টি-চিঠি'রও মূল বিষয় ছিল

তাই। সুতরাং রণদিভে ভীষণ ক্ষেপে গিয়ে ইতর ভাষায় গালি বর্ষণ করলেন বর্তমান জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ কমিউনিস্ট তত্ত্বকার আর চীন-বিপ্লবের মহান নায়ক মাও সে-তুঙের প্রতি।

রণদিভের এই চারটি প্রবন্ধের প্রধান বক্তব্য বিষয় ছিল সংক্ষেপে নিম্নরূপ :

ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লব মূলত শেষে হয়ে গেছে। ভারতে সামন্ততন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণ আর নেই, তা থাকলেও নগণ্য। এখানে ধনতান্ত্রিক শিল্পের যথেষ্ট বিকাশ হয়েছে। ভারতের গোটা বুর্জোয়াশ্রেণীই এখন স্বাধীনভাবে এবং একাকী শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণ করছে, শাসন করছে। বুর্জোয়াদের মধ্যে জাতীয়-বুর্জোয়া আর একচেটিয়া-বুর্জোয়া বলে কোন ভাগাভাগি নেই। সুতরাং গোটা বুর্জোয়াশ্রেণীই এখন শ্রমিকশ্রেণী আর জনসাধারণের প্রধান শত্রু। কাজেই এখনকার প্রধান লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র-বিরোধী বিপ্লব নয়, প্রধান লক্ষ্য হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বারা বুর্জোয়াশ্রেণীর হাত থেকে শাসন-ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া, শ্রমিকশ্রেণীর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। শহর অঞ্চলে যেমন কল-কারখানায় মালিক বুর্জোয়া-শ্রেণীর প্রভুত্ব, তেমনি গ্রামাঞ্চলেও ধনী-কৃষকের অর্থাৎ ধনতন্ত্রের প্রভুত্ব। বেশীর ভাগ কৃষক এখন ক্ষেত-মজুরে পরিণত হয়েছে। সুতরাং শ্রমিক-বিপ্লবের দ্বারা যেমন শহর-অঞ্চলে বুর্জোয়াশ্রেণীর, তেমনি গ্রামাঞ্চলে ধনী-কৃষকের প্রভুত্বের উচ্ছেদ করতে হবে। মাঝারি-কৃষককে ক্ষেত-মজুরদের সহায়করূপে পাওয়া যাবে। ভারতের বিপ্লব হবে ঠিক রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লব অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক বিপ্লবের মত। ভারতেও এখন শ্রমিক বিপ্লবের দ্বারা শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

রণদিভে তাঁর প্রবন্ধগুলিতে এই তত্ত্বের নজির হিসাবে রাশিয়ার শ্রমিক বিপ্লবের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করলেন, আর লেনিন ও স্তালিনের রচনাবলী থেকে অজস্র উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর বক্তব্য জোরালো করার চেষ্টা করলেন। রণদিভে যেন ইচ্ছা করেই এই মহাসত্যটি এড়িয়ে

গেলেন যে, ভারতীয় সমাজের মূলভিত্তি স্বরূপ এই অর্থনৈতিক কাঠামোটা সম্পূর্ণ সেকেলে, সামন্ততান্ত্রিক ; নগণ্য সংখ্যক শহর বাদে ভারতের সমগ্র গ্রামাঞ্চল, প্রায় ৬০ লক্ষ গ্রামই সামন্ততন্ত্রের ঘাঁটি, আর সমগ্র জনসংখ্যার ৫ ভাগের ৪ ভাগ অর্থাৎ প্রায় ৪০ কোটি কৃষকই সামন্ততন্ত্রের নাগপাশে বাঁধা। এই সামন্ততান্ত্রিক অচলায়তনকে চূর্ণ করতে না পারলে সমাজের অগ্রগতি ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কথা সম্পূর্ণ অবাস্তব. পাগলের প্রলাপ মাত্র।

তেলেঙ্গানা বিপ্লবের ভিত্তি ছিল স্তালিন ও মাও সে-তুঙের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্ব। রণদিভে বুঝেছিলেন, মাও আর তাঁর তত্ত্বকে আক্রমণ না করলে, একে মিথ্যা প্রমাণিত করতে না পারলে, তেলেঙ্গানা বিপ্লব তথা ভারতের ক্রমবিকাশমান জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রগতি রোধ করা যাবে না। তাই রণদিভে অতি-বিপ্লবীয়ানার ভাব দেখিয়ে আর লেনিন-স্তালিন ও শ্রমিক বিপ্লবের নাম করে কুৎসিত ভাষায় আক্রমণ করলেন বর্তমান কালের সর্বশ্রেষ্ঠ মার্কসবাদী, কমিউনিস্ট নায়ক মাও সে-তুঙের উপর। রণদিভে তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধগুলির একটিতে ঘোষণা করলেন : "প্রথমত আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি কেবল মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন আর স্তালিনকেই মার্কসবাদের একমাত্র উৎস বলে স্বীকার করে। এঁদের বাইরে আর কোন প্রামাণ্য উৎস তাঁরা খুঁজে পায়নি। তথাকথিত নয়া-গণতন্ত্রের যে তত্ত্ব মাও সে-তুঙের আবিষ্কার বলে এবং তাকে মার্কসবাদে নতুন যোজনা বলে প্রচার করা হয়, সেই তত্ত্ব কোন কমিউনিস্ট পার্টিই আজ পর্যন্ত স্বীকার করেনি।" (রণদিভে : 'নয়া-গণতন্ত্রের সংগ্রাম')

১৯৪৯ সালের মধ্যভাগে রণদিভে সাহেব তেলেঙ্গানার জন-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিবর্তে তাঁর বহুঘোষিত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আরম্ভ করে দেন। তাঁর সংগ্রামের প্রধান রূপ হল ট্রাম-বাসের উপর পটকাবাজি। তিনি এই সময় সমগ্র কৃষক সম্প্রদায়কে প্রতিক্রিয়াশীল বলে ঘোষণা করে এক প্রবন্ধ পার্টির মধ্যে প্রচার করলেন। এই প্রবন্ধে তিনি মাও সে-তুঙকে "অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের

মার্কসবাদী" আখ্যা দেন, আর পার্টির মধ্যে যাঁরা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশ্বাস করতেন এবং কৃষক সম্প্রদায়কে সেই বিপ্লবের প্রধান বাহিনী বলে মনে করতেন তাঁদের এই মতকে "দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতি" বলে গাল দেন। শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার কথা "যথেষ্ট জোরের সঙ্গে" প্রচার না করার জন্যও রণদিভে সাহেব তাঁদের মুণ্ডুপাত করেন। এই প্রবন্ধে তিনি তাঁর নিজস্ব উৎকট 'মার্কস্‌বাদ' জাহির করে আর মাও সে-তুঙ ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির ব্যর্থতা ব্যাখ্যা করে লিখেছেন :

"মাও সে-তুঙের কয়েকটি তত্ত্ব এমনই যে, কোন কমিউনিস্ট পার্টিই তা মেনে নিতে পারে না। সে সব তত্ত্ব জগতের বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টির ধ্যান-ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। চীনা কমিউনিস্ট-দের এত দীর্ঘকাল গৃহযুদ্ধ চালাতে হয়েছে কেন? তার কারণ, চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব মাঝে মাঝেই শ্রমিক নেতৃত্বে সংগ্রাম চালাতে এবং শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে জনসাধারণের ঐক্য গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। চীনের পার্টি যে কৌশলগত নীতি অনুসরণ করেছিল তার ফলেই মাঝে মাঝে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে।"

এতেও কিন্তু রণদিভে সাহেবের গায়ের জ্বালা মেটেনি। তিনি তাঁর এই প্রবন্ধে অবশেষে সরাসরি মাওয়ের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের তত্ত্বকে "ভয়ঙ্কর ও প্রতিক্রিয়াশীল", "মার্কস্‌বাদ-লেনিনবাদের মূলনীতি বিরোধী" প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে বলেছেন যে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে এ হেন মাওবাদের কোন অবদানই থাকতে পারে না। ১৯৪৮ সালে টিটোর অনুচর, আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা ভ্লাদিমির দেদিয়ে ভারতে এসেছিল পার্টি-কংগ্রেস উপলক্ষে। তার আসার উদ্দেশ্য ছিল তেলেঙ্গানা বিপ্লবকে হত্যা করা আর ভারতের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের অগ্রগতি রোধ করা এবং টিটোবাদের ঘাঁটি তৈরী করা। শোনা যায়, এই রণদিভে সাহেব সেদিন দেদিয়ের মারফত টিটোর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। তাই বোধহয় রণদিভে সাহেব তেলেঙ্গানা বিপ্লব, ভারতের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব আর মাও সে-তুঙের উপর আক্রমণ করেছিলেন।

এরপর অনেক কাল কেটে গেছে। এরপর মার্কসিস্ট-অমার্কস্‌সিস্ট এই উভয় দলই আবার আসরে নেমেছে তেলেঙ্গানা বিপ্লবের প্রভাব ভারতের মাটি থেকে নিঃশেষে মুছে ফেলার জন্য। এবার তেলেঙ্গানার উপর আক্রমণ আরম্ভ হয়েছে নতুন দিক থেকে। সেদিনকার আক্রমণেও তেলেঙ্গানা মরেনি, তার সাময়িক বিরতি ঘটেছিল মাত্র, আজ আবার তেলেঙ্গানা জেগে উঠছে ভারতের সর্বত্র। তাই নেতারাও আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে। আজ তারা প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে, সেদিনকার তেলেঙ্গানার সংগ্রাম ছিল অর্থনৈতিক দাবি-দাওয়ার সংগ্রাম, বৈপ্লবিক সংগ্রাম নয়। তা প্রমাণ করার জন্যই এদের 'দেশহিতৈষী' ও 'গণশক্তি' আর ওদের 'কালান্তর' আদাজল খেয়ে লেগেছিল। ১৯৬৮ সালের ১৫ই নভেম্বর, ময়দানে 'নভেম্বর দিবসের' সমাবেশে, 'মার্কস্‌বাদীদের' সেক্রেটারী সুন্দরায়া চীনের কমিউনিস্ট পার্টিকে লক্ষ্য করে খিঁচিয়ে ওঠেন: "আমাদের বিপ্লব আমরাই পরিচালনা করব। অন্য কোন পার্টির আদেশ-নির্দেশের অপেক্ষা আমরা রাখি না।"

এ তো রণদিভের পূর্বোক্ত প্রবন্ধেরই পুনরুক্তি মাত্র। যে কোন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি অন্য কোন দেশের কমিউনিস্টদের সমালোচনা করতে পারে। এই তো কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতা। সুন্দরায়া যে শ্রমিক আন্তর্জাতিকতা বিসর্জন দিয়েছেন, বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের পাঁকে তলিয়ে গেছেন, এই উক্তিটি তারই স্পষ্ট প্রমাণ। তারপর তিনি স্তালিন আর চীনের পার্টির নাম করে বলেছেন যে, তাঁরাও নাকি স্বীকার করেছিলেন, তেলেঙ্গানার লড়াই ছিল নিছক জমির লড়াই, অর্থনৈতিক লড়াই। আর স্তালিন ও মাও নাকি তেলেঙ্গানার সংগ্রাম বন্ধ করতে বলেছিলেন। সুন্দরায়া দুনিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলনের এই দুই মহান নামের আড়ালে দাঁড়িয়ে সত্যকে মিথ্যা, দিনকে রাত করতে চেয়েছেন। কিন্তু ভারতের বিপ্লব সম্বন্ধে স্তালিন যা বলেছেন তা আমরা তাঁর বহু রচনায় পড়েছি। চীনের পার্টি কি বলেছেন তাও আমরা জানি।

সুন্দরায়াকে জিজ্ঞাসা করি, সামন্ততান্ত্রিক জমিদার-জোতদার-গোষ্ঠীর হাত থেকে অস্ত্রের জোরে জমি কেড়ে নেওয়া, সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা আড়াই হাজার গ্রাম দখল করে মুক্ত অঞ্চল সৃষ্টি করা, আর সেখানে কৃষক জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা করা যদি হয় অর্থনৈতিক লড়াই, তবে বিপ্লবী সংগ্রাম কাকে বলে?

* * *

তেলেঙ্গানা ভারতের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের আহ্বান জানিয়ে গেছে। ভারতের শ্রমিক-কৃষক জনসাধারণ সে আহ্বান কান পেতে শুনেছে, তাকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে। সে আহ্বান জনসাধারণের মনে নতুন আশার আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। আজ সে আহ্বানে সাড়া জেগেছে ভারতের গ্রামে গ্রামে, ভারতের আকাশে বাতাসে। একচেটিয়া বুর্জোয়া আর জমিদার-গোষ্ঠীর, তাদের নানান নামের, নানান রঙের দালালদের শত চেষ্টা, শত চক্রান্ত উপেক্ষা করে ভারতে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব এগিয়ে যাবে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে তার পরিণতি ঘটবে। তেলেঙ্গানা জানিয়েছিল তারই আহ্বান।

দীর্ঘজীবী হোক ভারতের তেলেঙ্গানা!

———